হরিপুরের
হরেক কাণ্ড
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
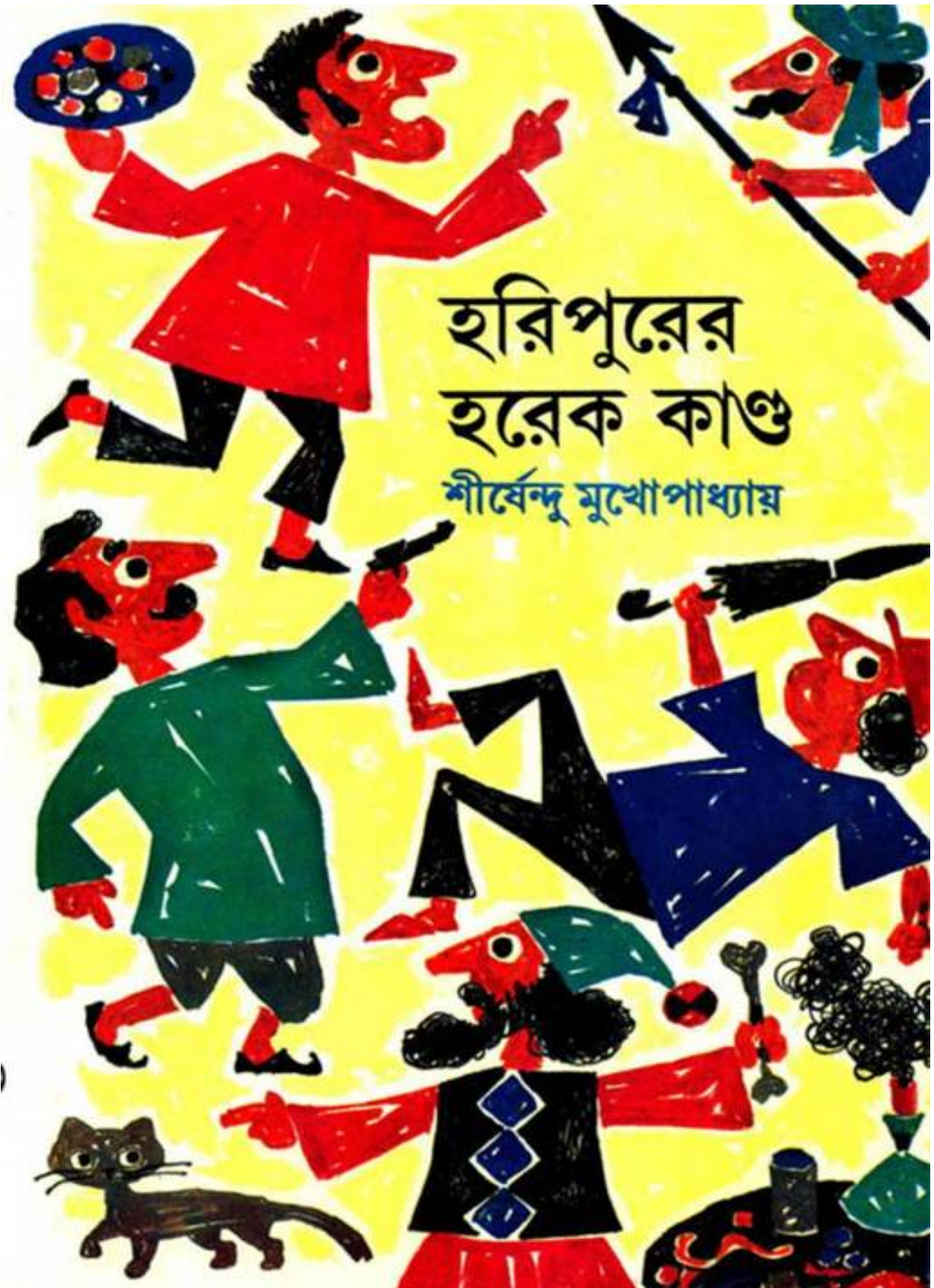
হরিপুরের হরেক কান্ড

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

গদাই নস্কর ডাকাতি ছাড়লে হবে কী, হাঁকডাক ছাড়েনি, আর নগেন দারোগা চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন বটে, কিন্তু দাপট যাবে কোথায়? গদাই যখন ডাকাত ছিল আর নগেন যখন দারোগা, তখন দুজনে বিস্তর লড়াই হয়েছে। গদাইকে দু-দুবার গ্রেফতার করেছিলেন নগেন, দুবারই গদাই গারদ ভেঙে পালায়। দুজনেই ছিলেন দুজনের জন্মশত্রু। এখনও যে তাঁরা পরস্পরকে খুব একটা পছন্দ করেন তা নয়। তবে সন্ধেবেলায় দুজনেই বসে হ্যারিকেনের আলোয় নিবিষ্ট মনে দাবা খেলেন। আজও খেলছিলেন।

শীতকালের শুরুতেই খুব ঝড়বৃষ্টি হয়েছে দুদিন ধরে। বাঘা শীতটা না পড়লেও উত্তুরে হাওয়ায় বেশ হি হি কাঁপুনি ওঠে। এই দুর্যোগের রাতে ডাকসাইটে জমিদার মহেন্দ্র দেবরায় তাঁর কাছারি ঘরে নিচু তক্তপোষে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বালপোষ গায়ে বসে গড়গড়া টানছেন। সামনে একট কাঠের চেয়ারে পা তুলে যে-লোকটা বসে আছে সে ত্রিশ বছর আগে ছিল রাজদ্রোহী পবনকুমার। মহেন্দ্রচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করে রাজ্যকে সুশাসিত করার জন্য যে প্রবল লড়াই করেছিল। আজ আর রাজ্যও নেই, সিংহাসনও লোপাট। মহেন্দ্রচন্দ্রের সময় কাটে না আর পবনকুমার মাস্টারির চাকরি থেকে রিটায়ার করে এখন একরকম ঘর-বসা। এই সন্ধেবেলাটা রোজই দুজনের দেখাসাক্ষাত হয়। সুখ-দুঃখের কথা ওঠে। অবিশ্যি আড্ডায় আরও দু-চারজন রোজই থাকে। আজ বৃষ্টি-বাদলা বলে আর কেউ আসেনি।

অ্যালোপ্যাথ শহিদলাল আগে হোমিওপ্যাথ বিশু দত্তকে দুচোখে দেখতে পারতো না। আর দুজনেই ছিলেন কবরেজ রামহরির চক্ষুশুল। আজকাল তিনজনেই রোজ একসঙ্গে বসে খুব মাথা নেড়ে-নেড়ে হেসে-হেসে গল্প করেন। শহিদলাল আজকাল প্রায়ই চ্যবনপ্রাশ বা আনিকা থার্টি খেয়ে থাকেন। বিশু দত্ত দরকার পড়লেই পাঁচন বা অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়ে থাকেন। রামহরিরও আজকাল অ্যালোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথিতে অরুচি নেই। আজ-সন্ধেবেলা তিনজনেই রামহরির বাড়িতে বসে বাজারদর নিয়ে কথা কইছেন।

মল্লবীর নয়ন হাতির সঙ্গে ব্যায়ামবীর বজ্র সেনের কোনওকালে সদ্ভাব ছিল না। আজকাল দুজনের মধ্যে খুব ভাব। সন্ধেবেলা নয়ন হাতির বাড়ির বৈঠকখানায় বসে দুজনে একটা শ্লেটে কাটাকুটি খেলছেন।

শ্মশানকালীর মন্দিরে বটবৃক্ষের তলায় বসে বিখ্যাত তান্ত্রিক জটেশ্বর আজও ভাবের ঘোরে মা মা বলে চেঁচাচ্ছিল। একটু পেছনে বসে পরম বৈষ্ণব গোপেশ্বর দাস মিটিমিটি হাসছিল। জটেশ্বরের পুজো শেষ হলে দুজনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবে। রোজই এরকমধারা হয়।

রাত আটটা বাজতে আর বিশেষ দেরি নেই। রাত আটটায়—ঠিক রাত আটটায় জড়িবুটিওলা শূলপাণি একটা বিকট অট্টহাসি হাসে। শীত-গ্রীষ্মবর্ষা, যাই হোক গত ত্রিশ বছর ধরে শূলপাণি কাঁটায়-কাঁটায় রাত আটটায় অট্টহাসি হাসবেই। অনেকেই সেই হাসি শুনে ঘড়ি মিলিয়ে নেন। শূলপাণিকে কেউ বলে পাগল, কেউ বলে ছদ্মবেশী মহাযোগী পুরুষ, কেউ ভাবে ম্যাজিসিয়ান, কেউ ভাবে প্রেতসিদ্ধ, কেউ ভাবে বৈজ্ঞানিক। শূলপাণি কোথা থেকে যে উড়ে এসে এ গাঁয়ে জুড়ে বসেছে তা কেউ জানে না। গাঁয়ের সরলাবুড়ির তিনকুলে কেউ ছিল না। সে-ই শূলপাণিকে আশ্রয় দেয়।

সরলা বুড়ি একশো চার বছর বয়সে মারা যাওয়ার সময় গাঁয়ের পাঁচজন মাতব্বরকে ডাকিয়ে এনে বলল, “বাবা সকল, শূলপাণিকে আমি ছেলের মতোই দেখি। বেচারা ভাবে ভোলা মানুষ। আমি মরলে তোমরা ওকে উৎখাত কোরো না। আমার ঘরেই থাকতে দিয়ো।”

তাতে অবশ্য গাঁয়ের লোকের আপত্তি হয়নি। সরলাবুড়ির পুরনো ঝুরঝুরে বাড়িটা পাকা হলেও ভগ্নদশা। বাঁশঝাড়ের পেছনে খালের পারে ওই বাড়িটার ওপর কারও কোনও লোভ ছিল না।

শূলপাণি রয়ে গেল। তবে সে খুবই রহস্যময় লোক। সে নানা ওষুধবিষুধ তৈরি করে। নানা প্রক্রিয়া জানে, ছোটখাটো ম্যাজিকও দেখাতে পারে। সে সাপ, পাখি, বিছে, হুলোবেড়াল, বাঁদর ইত্যাদি ধরে জীবজন্তু পোষে। তার একটা মড়ালে কুকুরও আছে। কেউ-কেউ বলে, সে কিছু ভূত আর পেত্নিও পুষে রেখেছে। কৃষ্ণপক্ষের রাতে সে যে মাঠে-ঘাটে ভূত ধরতে বেরোয়, তা ভিতু ভূতনাথবাবু, সাহসী বীরেনবাবু এবং আরও অনেকেই স্বচক্ষে দেখেছেন।

তা সে যা-ই হোক, গত ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন রাতে কাঁটায়-কাঁটায় রাত আটটায় শূলপাণির অট্টহাসি গাঁয়ের লোক শুনে আসছে। কোনওদিন নড়চড় হয়নি। শূলপাণি কেন হাসে তা অবশ্য অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেও জানা যায়নি। জিজ্ঞেস করলে শূলপাণি অম্লান বদনে শুধু বলে, “হাসি পায় বলেই হাসি”

শূলপাণির হাসির সঙ্গে এ-গাঁয়ের অনেক লোকেরই একটা রুটিন করা থাকে। যেমন শূলপাণি হাসলেই প্রিয়নাথবাবু ফটিককে পড়ানো বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠে পড়েন। আবার ওই হাসির শব্দ পেলেই মহেন্দ্র তার মুদির দোকানের

ঝাঁপ ফেলে হিসেব করতে বসে। শূলপাণি যেই হাসল, অমনি অন্নদাপিসি তাঁর জপ-আহ্নিক সেরে উঠে পড়েন। আর প্রবৃদ্ধ অন্নদাচরণ তাঁর ঠাকুদার আমলের পকেট-ঘড়িটার সময় ওই হাসির সঙ্গে রোজ মিলিয়ে নেন।

আটটা বাজে-বাজে। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছেন রাজদ্রোহী পবনকুমার। আটটা বাজলেই উঠে পড়বেন। আজ বাড়িতে সোনামুগ ডাল আর কাল নুনিয়া চালের খিচুড়ি হয়েছে।

মহেন্দ্রচন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "অমন ছটফট করছ কেন হে? কোন রাজকার্যে যাবে?"

পবনকুমার একটা শ্বাস ফেলে বলেন, "রাজকার্য তো তোমার। রাজাগজা লোকদেরই রাজকার্য থাকে।"

মহেন্দ্র একটু হেসে বললেন "আরে সেসব পাট তো চুকে গেছে কবে। এখন ঘরেরটা ভাঙিয়ে পেট চালানো । ঠাটবাট বজায় রাখা যাচ্ছে না। সবই তো জানো। এখন যা দুরবস্থা চলছে তাতে মনে হয় পঞ্চাশ বছর আগে তোমার তলোয়ারের কোপে বা বন্দুকের গুলিতে প্রাণটা গেলেই ভাল ছিল। তা হলে অবস্থার এই পরিবর্তনটা দেখতে হত না।"

খিদের চোটে পবনকুমারের পেট ডাকছিল। তবু হাসিমুখে বললেন, "তোমার হাতে আমি যদি মরতুম, তা হলেও মন্দ হত না। ইতিহাসে নাম থাকত মস্ত শহিদ বলে।"

শহিদলাল উসখুস করছিলেন, তাঁর দেওয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজছে। কিন্তু শূলপাণির অট্টহাসি শোনা গেল না। তবে কি ঘড়িটা ফাস্ট যাচ্ছে? ঘড়িটা নিয়ে তাঁর খুব অহংকার। বিলিতি ঘড়ি। আজ অবধি গত পঞ্চাশ বছর ধরে ঠিকঠাক সময় দিয়ে আসছে।

হোমিওপ্যাথ বিশু দত্ত আটটার ঘণ্টা শুনে ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "এবার ঘড়িটা বেঁচে দাও হে শহিদ, এ যে ঘোড়দৌড় লাগিয়েছে।"

কিন্তু কবিরাজ রামহরি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "শোনো বাপু, আমার যেন কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে।"

বিশু বললেন, "কিসের সন্দেহ?" কন্ডিশন রিফলেক্ট কাকে বলে তা তো জানোই। শূলপাণি রাত আটটার সময় অট্টহাসি হাসে। ত্রিশ বছর আগে প্রথম যেদিন হাসি শুনি সেদিন আমি ভীষণ চমকে গিয়ে ভয় খেয়েছিলাম। তারপর থেকে রোজ রাত আটটায় ওই হাসি শুরু হয় আর আমিও একটু চমকে উঠি। এই করতে-করতে এমন হল যে, ভিন গাঁয়ে বা শহরে গঞ্জে গেলেও রাত আটটার সময় আমি অজান্তে একবার চমকে উঠবই। শূলপাণির হাসি না শুনলেও ওই চমকে উঠলেই বুঝতে পারি আটটা বেজেছে। এই একটু আগেই ঘড়িতে শব্দ

হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই আমার চমকানি হয়েছে। সুতরাং ঘড়ি ঠিকই আছে। শূলপাণি আজ হাসেনি।

হতেই পারে না।

অসম্ভব। ঘড়ি ফাস্ট আছে। তোমার চমকানোটাই গণ্ডগোলের। এদিকে বজ্র সেন হঠাৎসোজা হয়ে বসে বললেন, “ওহে নয়ন, শূলপাণি হাসল না যে বড়!"

নয়নও অবাক হয়ে বলল, “তাই তো! সোয়া আটটা বাজে যে!” বজ্র সেন তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, “চলো তো, ব্যাপারটা দেখা যাক।”

"চলো, আমরা ছাড়া দেখবেই বা কে?”

গদাই নস্কর আর নগেন দারোগারই শুধু বাহ্যজ্ঞান ছিল না। দাবা খেলায় মজে ছিলেন দুজনেই।

হঠাৎ ভেতরবাড়ি থেকে নগেনের গিন্নি সুরবালা ঘরে ঢুকে আতঙ্কিত গলায় বললেন, “আজ শূলপাণি হাসল না যে গো ! গাঁয়ে বোধহয় এবার মড়ক লাগবে। কী অলক্ষুণে কাণ্ড!”

চেঁচামেচিতে দুজনেরই খেয়াল হল। নগেন আর গদাই সচেতন হলেন। নগেন অত্যন্ত রেগে গিয়ে বললেন, “হাসবে না মানে ! হাসতেই হবে । না হেসে যাবে কোথায় ও?”

সুরবালা রেগে গিয়ে বললেন, “সব জায়গায় দারোগাগিরি চলে না। যাও, গিয়ে দেখে এসে শূলপাণির কী হল! আমার বাপু মোটেই ভাল ঠেকছে না।”

কথাটা ঠিক। রাত আটটায় শূলপাণির অট্টহাসি না শুনে গোটা গাঁ-ই উদ্বিগ্ন এবং চিন্তিত। একে-একে টর্চ, লণ্ঠন আর ছাতা হাতে বিভিন্ন বাড়ি থেকে লোকজন বেরিয়ে এল রাস্তায় । বেশ একটু হই-হট্টগোলই হতে লাগল।

বাঁশঝাড়ের পেছনে শূলপাণির অন্ধকার বাড়িতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও মেলা লোক জড়ো হয়ে গেল। তারপর ডাকাডাকি, “শূলপাণি! ও শূলপাণি!” কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

২য় পরিচ্ছেদ

বৃষ্টি, বাতাস আর শীতের মধ্যেও শূলপাণির বাড়িতে বিস্তর মেয়ে-পুরুষ জড়ো হয়ে গেল। টর্চ, লণ্ঠন, হ্যাজাকবাতির অভাব হয়নি। সামনে একটু ফাঁকা জায়গায় আগাছ জন্মে আছে। আগে বাগান ছিল। শূলপাণির বাগানটাগানের শখ নেই। পেছনে সরলা বুড়ির পুরনো বাড়ি। দরজার পাল্লা হাট করে খোলা। শেকলে বাঁধা কুকুরটা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে।

নগেন প্রাক্তন দারোগা হলেও তারই অধিকার বেশি, সে সকলের দিকে ফিরে গমগমে গলায় বলল, “ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ, আপনারা কেউ ভেতরে যাবেন না। আমি আগে ঢুকে দেখি কী হয়েছে। যদি বিপজ্জনক কিছু ঘটে থাকে, ধরুন যদি কোনও খুনি শূলপাণিকে খুন করে ভেতরে ওত পেতে থাকে, কিংবা যদি কোনও বাঘ শূলপাণিকে খেয়ে ভেতরে এখনও বসে ঠোঁট চাটতে থাকে, কিংবা কোনও ভূত যদি–আচ্ছা, ভূতের কথা থাক। মোটকথা, আমি আগে শূলপাণির ঘরে ঢুকছি।”

নয়ন বলে উঠল, “কিন্তু আপনার তো পিস্তল নেই।”

নগেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, তাতে কি? আমার দুটো চোখই জোড়া পিস্তলের সমান। এই গদাইকেই জিজ্ঞেস করো না, কোনওদিন চোখে চোখ রেখে কথা কয়েছে?”

“কিন্তু খুনির কাছে পিস্তল থাকতে পারে তো নগেনবাবু?”

নগেন দারোগা হো হো করে হেসে উঠে বলল, “পারেই তো। আর সেইজন্যই আমি সবার আগে ঢুকতে চাইছি। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের। দারোগাগিরি করে হাসিমুখেই প্রাণ দেব। তোমরা বটতলায় আমার নামে একটা শহিদ বেদি বানিও।”

গদাই নস্কর ফিচিক ফিচিক হাসছিল। চাপা গলায় বলল, “আর লোক হাসিও না বাপু চম্বরপুরের জঙ্গলে আমার সাগরেদ কেলো বাঘের ডাক ডেকেছিল বলে তুমি ভয় খেয়ে কী পাঁই পাঁই করেই না ছুট দিয়েছিলে!”

নগেন বিরক্ত হয়ে বলল, “আচমকা ডেকে ওঠায় ভয় পেয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু বাঘের ভয় থাকলেও আমার ভালুকের ভয় নেই।”

“বাঘের চেয়ে ভালুক, আরও খারাপ। পাল্লায় পড়েনি বলে বলছ। বাঘ সব সময়ে তেড়ে আসে না, আর ভালুকের স্বভাবই হল কথা নেই বার্তা নেই তেড়ে এসে থাবা মারবে। অ্যাই বড় বড় নখ, বুঝলে?”

নগেন খুব বিরক্তির সঙ্গে বলে, “ভালুকের গল্প পরে হবে, হাতে জরুরী কাজ রয়েছে। চলো, ঘরে ঢুকে দেখা যাক।”

“কে আগে ঢুকবে? তুমি, না আমি ?”

নগেন বলল, “টস করা যাক।”

গদাই হেসে বলল, “তার দরকার নেই। তুমি রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাহাদুর তোমার পিস্তল নিয়ে নিয়েছেন। আমার তো সে বালাই নেই। আমার পেটকোঁচড়ে সবসময়ে পিস্তল থাকে। তবে পিস্তলের দরকার হবে না। খুনি হোক, বাঘ হোক, এত লোক দেখে সে বসে নেই। এসো।”

গদাই ভেতরে ঢুকে চারদিকে টর্চ ফোকাস করে বলল, "ওহে নগেন, ব্যাপার সুবিধের নয়।"

টর্চের আলোয় যা দেখা গেল তা সুবিধের ব্যাপার নয় ঠিকই। শূলপাণির ঘর একেবারে লণ্ডভণ্ড। ঘটি বাটি বিছানা বাক্স সব ছত্রাকার ছড়িয়ে আছে। বানরটা ঘরের উঁচু একটা তাকে উঠে বসে আছে। ঘরের কোণে বসে বেড়ালটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস আওয়াজ ছাড়ছে। মড়ালে কুকুরটা কোনও কালে বাঁধা থাকে না। সেটা আজ নতুন একটা চেন দিয়ে ভেতরের দরজার কড়ার সঙ্গে বাঁধা। চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বেচারার গলা ভেঙে গেছে। গাঁয়ের লোক দেখে সে নিজস্ব ভাষায় নানারকম নালিশ জানাতে লাগল।

নগেন বলল, "শূলপাণি কি খুন হল নাকি হে গদাই?"

"আগেই খুন ধরে নিচ্ছ কেন? রক্তপাত তো হয়নি দেখছ?"

"আহা, গলায় ফাঁস দিয়ে যদি—"

"তাহলে লাশ যাবে কোথায় ?"

"সরিয়ে ফেলেছে।"

"কেন সরাবে ?"

"প্রমাণ লোপ করার জন্য।"

"নাঃ, তুমি দারোগ হলেও বুদ্ধি খাটাচ্ছ না। লাশ সরানোর পরিশ্রম কম না। বিশেষ কারণ না থাকলে কেউ একটা ডেডবডি-কাঁধে করে নিয়ে যায় না, ফেলেই যায়।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে নগেন বলল, "তাই বটে। এসব তো তুমি ভালই জানো। অনেক করেছ কিনা, তাই অভিজ্ঞতা থেকেই বলছ।"

"অভিজ্ঞতার চেয়েও বড় কথা হল কমন সেন্স। তার জন্য মাথা খাটানো চাই। তুমি আস্ত পাঠা বা দেড়খানা পাকা কাঁঠাল খেতে পারো বটে, কিন্তু মস্তিস্কচালনা তোমার একেবারে নেই। পেটের ব্যায়ামই হয়েছে, মাথার ব্যায়াম হয়নি। যদি তাই হত তা হলে দু-দুবার তোমার গরদ থেকে আমি পালিয়ে যেতে পারতাম না।"

"অত বাহাদুরি কোরো না। আমার ফোর্সের মধ্যেও তোমার লোক ছিল। তারাই তোমাকে পালানোর পথ করে দিয়েছিল |"

"সেটা ধরতে তোমার এতদিন সময় লাগল কেন? যাকগে, এখন এসো, শূলপাণির ঘরদোর ভাল করে দেখে পরিস্থিতিটা খতিয়ে দেখা যাক।"

একটু কাঁপা গলায় পেছন থেকে ভূতনাথ বলে উঠল, "দেখার কিছু নেই ভায়া। আমি সেই কবেই শূলপাণিকে বলেছিলুম, ওরে শূল, ভূত-প্রেত ধরে অধর্ম করিস না। ওরাই একদিন তোর ঘাড় মটকাবে। সেই কথাই ফলে গেল।"

ভিড় ঠেলে জটেশ্বর তান্ত্রিক এগিয়ে এসে বলল, “কটা ভূত ছিল শুনি শূলপাণির? সব গাঁজাখুরি গল্প। এ-গাঁয়ের সব ভূত শ্মশানকালী মন্দিরের বট আর অশ্বত্থগাছে ঝুলে আছে। আমি গুনে দেখে এসেছি একটু আগে। মোট সাতশো তিরানব্বইটা। এ-গাঁয়ে ও কটাই আছে। তাও চারশোর ওপর হচ্ছে বহু পুরনো ভূত। তাদের কারও-কারও বয়স হাজারের ওপরে। ঝুরঝুরে চেহারা, আবছা হয়ে এসেছে, তারা সাতে-পাঁচে থাকেও না। ভূতের নামে খবদার বদনাম দেবেন না।”

ভূতনাথ রামনামটা একটু থামিয়ে কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, “বদনাম করিনি বাপু, পাঁচজনে বলছিল আর কি।”

বৈষ্ণব গোপেশ্বর দাস জটেশ্বরের পিছুপিছু এসে মিষ্টি করে বলল, "শূলপাণি কি কৃষ্ণে লীন হয়েছেন? এখানে এত গোল কেন?”

গোপেশ্বর বিনয়ী হলেও চতুর লোক। গাঁয়ের সবাই তাকে সমঝে চলে। পবনকুমার তার দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, “শূলপাণি কৃষ্ণে লীন হলে তোমার সুবিধেটা কী বলো তো!”

“হরি হরি। আমার সুবিধে হবে কেন? জীবাত্মা যদি পরমাত্মায় মিলে গিয়ে থাকে তাহলে তো ভাল কথাই।”

“না, ভাল কথা নয়। এ-গাঁয়ের অনেকের ধারণা আছে যে, সরলাবুড়ির গুপ্তধন ছিল। আর সেই গুপ্তধনের সন্ধান সে শূলপাণিকে দিয়ে গেছে। সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি কেউ তার কাছ থেকে গুপ্তধনের সন্ধান আদায় করার জন্য গুম করে থাকে, তা হলে আশ্চর্য হব না। গোপেশ্বর, তোমাকে পরশুদিন দেখেছি বটতলায় বসে জটেশ্বরের সঙ্গে শূলপাণির গুপ্তধন নিয়ে কথা কইছিলে।”

রাজদ্রোহী পবনকুমারকে সবাই একটু ভয় খায়। এক সময়ে দুরন্ত পবনকুমারের দাপটে সবাই থরহরি ছিল।

গোপেশ্বর মিনমিন করে বলল, “সবাই বলে, আমরাও বলি। দোষের তো কিছু নয়। বিষয়-আশয়ে ডুবে থাকে জীব, সেই নিয়েই কথা হয়। তবে শূলপাণির কী হয়েছে তা আমাদের জানা নেই।”

কে যেন বলল, “ভূতপ্রেত নয়, গুপ্তধনও নয়। আমি ভাল করেই জানি, শূলপাণি একজন ছদ্মবেশী বৈজ্ঞানিক। একদিন দুপুরে আমি এ-বাড়ি থেকে নীল আর লাল ধোঁয়া বেরোতে দেখেছি।”

গায়ের উটকো লোক রাখাল বলল, “আমি সবুজ ধোঁয়াও দেখেছি।”

বজ্র সেন বলল, “মনে হয় শূলপাণিকে আমরা ঠিক চিনতে পারিনি। তার কোনও বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের জন্যই তাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে কেউ। ”

নগেন দারোগ বলল, “ওসব আষাঢ়ে গল্প। ”

সুধার ঘোষ বলল, “আচ্ছা দারোগাবাবু, শূলপাণির কি ঘড়ি ছিল?”

“জানি না।”

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, “ছিল না ! ছিল না !”

সুধীর বলল, “ঘড়িই যদি ছিল না তা হলে শূলপাণি কি করে রাত আটটা বাজলে টের পেত আর হেসে উঠত বলুন তো!"

নগেন দারোগা খেঁচিয়ে উঠে বলল, “তার আমি কী জানি?”

সুধীর ঘোষ বলল, “তাতেই তো প্রমাণ হল শূলপাণি একজন বৈজ্ঞানিকই ছিল।”

নগেন দারোগা চোখ কটমট করে বলল, “কী করে প্রমাণ হল?”

সুধীর ঘোষ সকলের দিকে চেয়ে বলল, “হল কি না ভাইসব ?”

সবাই বলে উঠল, হ্যাঁ হ্যাঁ, “হলই তো।”

নগেন দারোগা মাথা নেড়ে বলল, “ডিসগাস্টিং।”

৩য় পরিচ্ছেদ

যত রাত বাড়ছে দুর্যোগও ততই বাড়ছে। ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি শুরু হওয়ায় শূলপাণির বাড়িতে জড়ো হওয়া লোকজন টকাটক সরে পড়তে লাগল। শেষ অবধি দারোগাবাবু, গদাই আর পবনকুমার ছাড়া কেউ রইল না।

গদাই শূলপাণির লণ্ঠনটা জেলে মাঝখানে রাখল। তারপর তিনজন বসল পরামর্শ করতে।

নগেন বলল, পবনবাবু, আপনার অভিজ্ঞতা অনেক। শূলপাণির কী হতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?

পবনকুমার মাথা নেড়ে বলল, অনুমান করতে বলছেন? তাতে লাভ কী? শূলপাণিকে চিনি বটে, কিন্তু তার সম্পর্কে জানি কতটুকু? একটা লোকের স্বভাব-চরিত্র বা অতীতের জীবন খানিকটা জানলে অনুমান করা শক্ত হত না। কিন্তু শূলপাণি গাঁয়ের লোকই নয়। সরলা পিসি তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। সে গাঁয়ের কারোও সঙ্গে বিশেষ মিশত না, আপন খেয়ালে নানা পাগলামি করে বেড়াত। এরকম লোক সম্পর্কে কিছু কি বলা যায়? ফলে সকালে পুলিশে খবর দিলে তারাই যা করার করবে।

প্রত্যন্ত গাঁয়ে একটা পাগল নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে পুলিশ তেমন গুরুত্ব দেবে না। নিয়মমাফিক একটু খোঁজাখুঁজি করে ছেড়ে দেবে।

পবনকুমার বলল, তা জানি। তবু পুলিশকে জানিয়ে রাখা ভাল। আমরা তো আর হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব না। কাল সকালে জেলেপাড়ায় খবর দিলে তারা গাঁয়ের পুকুরগুলোতে জাল ফেলে দেখবে শূলপাণির লাশ পাওয়া যায় কি না।

যদি পাওয়া না যায়?

তাহলে ধরে নিতে হবে হয় সে আপন খেয়ালে কোথাও চলে গেছে, কিংবা কেউ তাকে গুম করেছে। দ্বিতীয় সম্ভাবনাটা খুবই ক্ষীণ। শূলপাণিকে গুম করে কারও কোনও লাভ হবে বলে তো মনে হয় না।

নগেন দারোগা বলল, গুপ্তধনের কথা কী যেন আপনিই বলছিলেন। পবনকুমার হেসে বলে, ওটা কথার কথা। গোপেশ্বরকে একটু ভড়কে দেওয়ার জন্য বলা। আসলে সরলা পিসিকে আমি আমার ছেলেবেলা থেকে জানি । তাঁর গুপ্তধন থাকার কথাই নয়। সামান্য টাকা-পয়সা যা ছিল তা শূলপাণিকে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সেই টাকার পরিমাণ সামান্যই হবে। আপনারা এত আগেই রগরগে ঘটনা কল্পনা করছেন কেন? শূলপাণি ফিরেও আসতে পারে।

গদাই নস্কর এতক্ষণ চুপচাপ বসে কথা শুনছিল। এবার বলল, কথাটা যুক্তিযুক্তই মনে হচ্ছে। কিন্তু পবনবাবু, শূলপাণি গাঁছেড়ে যাওয়ার লোক নয়। এই হরিহরপুর তার খুব পছন্দের জায়গা। তাছাড়া সে তার পোষা জীবজন্তুদেরও খুব ভালবাসত। এদের এরকমভাবে ফেলে সে কোথাও চলে যাওয়ার পাত্র নয়। শূলপাণি পাগল, আমিও মানছি। কিন্তু সে উন্মাদ পাগল নয়। ছিটিয়াল বলতে পারেন।

পবনকুমার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, সেটাও ভাবছি। তবু কাল অবধি দেখা যাক। তার আগে ঘরটা সার্চ করলে কেমন হয়? নগেনবাবু তো একাজে পাকা ।

নগেন চারদিকটায় একটু চোখ বুলিয়ে ভু কুঁচকে বলল, দেখার তেমন কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। পাগলা শূলপাণি রাজ্যের অকাজের জিনিস জড়ো করে রেখেছে দেখছি। তবু আপনি যখন বলছেন তখন দেখছি।

গদাই বলল, চলো, আমিও হাত লগাই। অবশেষে তিনজনই কাজে নেমে পড়ল। গদাইয়ের চৌকির নিচে একটা টিনের তোরঙ্গ পাওয়া গেল। তাতে পায়জামা, পুরনো কোট, কিছু কাপড়চোপড় ছাড়া একটা ম্যাজিক ওয়ার্ল্ড পাওয়া গেল। সরলাবুড়ির একটা আলমারি আর বাক্স খুলে রাজ্যের ন্যাকড়া, থান, জপের মালা, কাঁথা, পুরনো তেঁতুল, অজস্র কৌটোর মধ্যে ছাতা-পড়া মশলাপতি ইত্যাদি বেরোলো। বাড়িতে আরও দুখানা ঘর আছে বটে, কিন্তু সেগুলো ব্যবহারযোগ্য নয়। ছাদ ফেটে গেছে, দেয়ালে ফাটল, রাজ্যের ধুলোময়লা জমে আছে।

গদাই ওপরের তাক থেকে একটা ছোটো কাঠের বাক্স টেনে নামাল। বাক্সটা পুরনো হলেও বেশ মজবুত। গায়ে কারুকাজ রয়েছে। বাক্সটা তালা দেওয়া। গদাই তালাটা নেড়েচেড়ে বলল, এ তো বিলিতি তালা দেখছি। শূলপাণি এ তালা পেল কোথায় ?

পবনকুমার ভু কুঁচকে বলল, এটা সরলা পিসির জিনিস নয়। আমি ছেলেবেলা থেকেই এ বাড়িতে আসা-যাওয়া করি। সরলা পিসি নারকোলের নাড়ু, তিলুড়ি, পিঠে করে কত খাইয়েছে। তিনকুলে কেউ ছিল না তো, তাই আমাদের খুব ভালবাসত। তার জিনিসপত্র সব আমাদের চেনা। বাক্সটা খুলুন গদাইবাবু।

শূলপাণির জিনিস, খোলা কি ঠিক হবে?

নগেন বলল, ও হে, আমি তো প্রাক্তন দারোগা । আমার সামনেই তো খুলছো। বিপদে নিয়মো নাস্তি।

তাহলে দেখা যাক চাবি পাওয়া যায় কি না। চাবি পাওয়া গেল। শূলপাণির লণ্ডভণ্ড বিছানা হাতড়ে চাবিটা বের করে এনে ভারী বাক্সর ডালাটা খুলে ফেলল গদাই। তারপর অবাক হয়ে বলল, কিছুই তো নেই দেখছি। কয়েকটি কড়ি আর গোটা কয়েক তামার পয়সা।

তিনজনই ঝুঁকে দেখল, তাই বটে। মোট সাতটা কড়ি আর সাতটাই তামার পয়সা পড়ে আছে বাক্সের মধ্যে। আর কিছুই নেই। নগেন বলল, এই তুচ্ছ জিনিসের জন্য বিলিতি তালা?

পবনকুমার বলল, তাই তো দেখছি। কড়ি আর পয়সাগুলো নেড়েচেড়ে দেখে গদাই বলল, এ ব্রিটিশ আমলের পুরনো পয়সা। আচল জিনিস। আর কড়িগুলোরও তেমন বৈশিষ্ট্য কিছু নেই।

পবনকুমার বলল, নাঃ, কোনও রহস্যেরই আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। দারোগাবাবু, তাহলে চলুন ঘরে ফেরা যাক। আজ রাতটা ভেবেচিন্তে কাল যা হয় করা যাবে।

হ্যাঁ, তাই ভাল। চলুন।

গদাই বলল, কিন্তু এই অবোলা জীব-জন্তুগুলোর কী ব্যবস্থা হবে? এদের দেখভাল করবে কে?

নগেন বলল, আমার অনেকদিন ধরে একটা বাঁদর পোষার শখ। বাঁদরটা আমি নিয়ে যেতে পাড়ি।

গদাই বলল, কুকুরটা আমি নেবো।

পবনকুমার বলল, তাহলে বেড়ালটা আমার কপালে?

বেড়াল আমি একদম পছন্দ করি না। তবু অসহায় জীব বলে নিতে রাজি আছি।

কার্যকালে দেখা গেল, প্রস্তাব যত সহজ কাজটা তত সহজ নয়। দারোগাবাবু যতই চেষ্টা করলেন বাঁদরটা ততই লাফঝাঁপ করে নাগাল এড়িয়ে গেল। গদাই শিকল খুলতে যেতেই কুকুরটা এমন তেড়ে এল যে গদাই আর এগোলো না। আর বেড়ালটা স্রেফ একটা লাফ মেরে ভেতরের ঘরে পালিয়ে গেল।

লণ্ঠন নিবিয়ে টর্চ জেলে গদাই বলল, কাল সকালে যা করার করা যাবে। কিন্তু সদর দরজাটা কি খোলা থাকবে?

পবনকুমার বলল, দামী জিনিস যখন কিছু নেই তখন থাক খোলা। তিনজনেই বেরিয়ে বৃষ্টি-বাদলার মধ্যেই এগোতে লাগল। হঠাৎ পবনকুমার দাঁড়িয়ে বলল, নগেনবাবু, গদাইবাবু, আমার মনে হচ্ছে কাঠের বাক্সট ফেলে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না।

কেন বলুন তো? কারণ বলতে পারব না, মনটা টিকটিক করছে। আমার মনে হয় ওটা নিয়ে আসা ভাল। শূলপাণি যদি ফিরে আসে তখন ফেরত দেওয়া যাবে।

নগেন বলল, ইচ্ছে হলে নিয়ে আসুন। বাধা কিসের? আমরা দাঁড়াচ্ছি, আপনি যান।

পবনকুমার দ্রুত ঘরে ফিরে এসে টর্চ জ্বাললেন। যা দেখলেন তাতে তার বাক্য হারিয়ে গেল। বাক্সটা তাকের ওপর নেই।

গদাই জিজ্ঞেস করল, কী হল পবনবাবু ?

শিগগির আসুন।

দুজনেই দৌড়ে এল।

পবনকুমার টর্চের আলো ফেলে বলল, দেখুন, কাণ্ড। তিনজনেই কিছুক্ষণ হাঁ হয়ে চেয়ে রইল। তারপর গদাই তার পেটকোঁচর থেকে রিভলভার বের করে হাতে নিয়ে ভেতর বাড়িতে ছুটে গেল। পিছু পিছু পবন আর নগেন। কোথাও কাউকে দেখা গেল না। সব শুনসান। পবন বলল, আশ্চর্য কাণ্ড! ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি? নগেন মাথা নেড়ে বলল, না, ভূতের কাজ নয় । এ পাকা লোকের কাজ ।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শেষরাতে বৃষ্টি থেমে দুর্যোগ কেটে গেল। সকালবেলায় কুয়াশায় মাখা একটু রোদও উঠল। এই সাতসকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছে মদন হালদার আর সুজন বোস। দুজনেরই বয়স সত্তরের ওপরে।

মদন বলল, এবার গাঁয়ে একটা অনাসৃষ্টি না হয়েই যায় না। সুজন সায়েন্স জানা লোক। বিলেতে আমেরিকায় বিজ্ঞানী হিসেবে অনেকদিন চাকরি করে

এসেছে। শেষ জীবনে একটু শান্তিতে নিরিবিলি জীবন কাটাতে হরিপুরের পৈতৃক ভিটেয় ফিরে আসা। তবে একা থাকতে হয়, ছেলেমেয়েরা সব বিদেশে পাকাপাকিভাবে থেকে গেছে। স্ত্রীও এই অজ পাড়াগাঁয়ে আসতে রাজি নয়। একগুয়ে সুজন একাই আছে। মদনের কথাটা শুনে ভু কুঁচকে বলল, কেন বলো তো !

শূলপাণির কথাই বলছি। কাল রাত আটটায় তার হাসি শোনা গেল না। গাঁ শুদ্ধ লোক গিয়ে জড়ো হল তার বাড়িতে। কিন্তু সব ভোঁ ভাঁ, শূলপাণি হাপিস ।

হ্যাঁ, ঘটনার কথা শুনেছি। কিন্তু তার সঙ্গে হরিপুরের অনাসৃষ্টির সম্পকটা কী?

কি জানি ভাই, মনে হয় এসব অলক্ষুণে কাণ্ড। হরিপুর শান্ত জায়গা, এখানে এরকম অদ্ভুত ঘটনা ঘটে না।

সুজন একটু হেসে বলল, তোমাদের সাবালক হতে আরও কতদিন লাগবে সে কথাই ভাবছি। শূলপাণি হাসেনি বলে সবাই নানা রকম আশঙ্কা করছে কেন তাও বুঝতে পারছি না। ও তো একটা পাগল। পাগলের কাণ্ডর কি কোনও লজিক্যাল ব্যাখ্যা হয় ? সোজা কথা হল, শূলপাণি কোথাও চলে গেছে।

তা হতে পারে। কিন্তু তুমি কি শূলপাণিকে ভাল করে চিনতে?

খুব চিনতাম। আমি সায়েন্টিস্ট বলে সে প্রায়ই আমার কাছে আসত আর নানা উদ্ভট জিনিস জানতে চাইত।

কিরকম? পাখির মতো আকাশে ওড়া যায় কি না, কোনও জিনিস শূন্যে কী করে ভাসিয়ে রাখা যায়, একজন মানুষের মুণ্ডু আর একজনের ধড়ের সঙ্গে জুড়ে দিলে কি হয় এইসব আবোল তাবোল। আমি বেশি পাত্তা দিইনি।

কিন্তু রাত আটটার সময় শূলপাণি অট্টহাসি হাসত কেন তা ভেবে দেখেছো?

কন্ডিশন রিফ্লেক্স কাকে বলে জানো তো?

হ্যাঁ, পাবলভের থিয়োরি। আমার মনে হয় এটাও ওরকম কিছু। এ ছাড়া অন্য কোনও কারণ নেই।

তুমি বৈজ্ঞানিক মানুষ, বিশ্বাস করবে না জানি। কিন্তু শূলপাণির কিছু অদ্ভুত ক্ষমতাও ছিল।

কিরকম ক্ষমতা ?

সে খালি হাত মুঠো করে অনেক জিনিস মুঠো থেকে বের করতে পারত।

সুজন হেসে বলল, ও তো রাস্তার বাজিকররাও দেখাতে পারে। এমন কি আমিও পারি। হাতসাফাই ছাড়া কিছু নয়।

একদিন সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কিসের গন্ধ ভালবাসি। আমি বললাম, কস্তুরী। কী করল জানো? আমার ডান কজিতে স্রেফ ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা ঘষে দিল অমনি ভুরভুর করে কস্তুরীর গন্ধ বেরোতে লাগল।

ভায়া হে, ওটাও কোনও মির‍্যাকল নয়। একটু প্র্যাকটিস করলেই পারা যায়। শূলপাণি সম্পর্কে তোমরাই একটা রহস্যের ঘেরাটোপ গড়ে তুলেছে। গাঁয়ে-গঞ্জে এরকম হামেশাই হয়।

তুমি কি বলতে চাও লোকটা বুজরুক?

তাও নয়। বুজরুকের অন্যকে ঠকানোর মতলব থাকে। শূলপাণির সে মতলব ছিল না। তবে সে যে পাগল তাতে সন্দেহ নেই। একবার আমার কাছে কতগুলো জিনিস দেখাতে এনেছিল।

কি জিনিস ?

কয়েকটা কড়ি আর তামার পয়সা।

বলো কী? কাল তার ঘরে একটা কাঠের বাক্সে নাকি পাওয়া গিয়েছিল জিনিসগুলো। কিন্তু সেগুলো কে বা কারা সরিয়ে ফেলেছে। .

সুজন এবার একটু চিন্তিত হয়ে বলল, সরিয়ে ফেলেছে?

হ্যাঁ হে, দারোগাবাবুর নাকের ডগায় ঘটনা। তা তোমার জিনিসগুলো দেখে কী মনে হয়েছিল?

মাথা নেড়ে সুজন বলে, কিছুই নয়। সাধারণ তামার পয়সা, সাধারণ কড়ি। কোনও গুপ্তধন নয় ।

আর কিছু হতে পারে কি?

কোনও সংকেত? তা আমি জানি না। মোট সাতটা কড়ি, আর সাতটা পয়সা ছিল। সংকেত হলেও তা ভেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে পয়সাগুলো বহু পুরনো। কোনও কালেকটারকে বেচলে কিছু টাকা পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তার বেশি কিছু নয়।

তোমার বাড়িতে তো একটা ল্যাবরেটরি আছে!

তা আছে। তবে গাঁ-গঞ্জে তো আর আধুনিক ল্যাব করা সম্ভব নয়। এ গাঁয়ে এখনও ইলেকট্রিকই আসেনি। সুতরাং ল্যাব বলতে যা বোঝায় তা নয়। ছোটোখাটো জিনিস বা এক্সপেরিমেন্ট হতে পারে। কিন্তু কেন বলো তো? ঐ কড়ি আর পয়সা ল্যাবরেটরিতে একটু পরীক্ষা করে দেখলে পারতে। সুজন হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, আমি ওরকম কাজ করতে যাবো কেন বলো তো? কড়ি আর পয়সার মধ্যে কী এমন থাকতে পারে?

না-ই যদি থাকবে তাহলে তা চুরি যাবে কেন? চিন্তিত সুজন বলে, সেটা একটা ভাবার মতো কথা। ওই সামান্য জিনিস নিয়ে কারও কোনও লাভ নেই। অন্তত কমন সেন্স সেই কথাই বলে। তবে সংকেত হলে আমার কিছু বলার নেই।

সাতটা পয়সা এবং সাতটা কড়ি-ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় মনে হয় না?

রহস্য মনে করতে চাইলে করতে পারো। বাধাটা দিচ্ছে কে?

৫ম পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্রচন্দ্রকে ইদানীং ভারি আলিস্যিতে পেয়েছে। আগে সারা তল্লাট ঘুরে বেড়াতেন, কখনও মোটরবাইকে, কখনও ঘোড়ায় চেপে, কখনও পায়ে হেঁটে, সাঁতার কাটতে ভালবাসতেন, ফুটবল বা টেনিস খেলাতেও খুব আগ্রহ ছিল। কিন্তু জমিদারি যাওয়ার পর থেকেই একটু একটু করে গুটিয়ে নিলেন নিজেকে। এখন বাড়ি ছেড়ে যাননি, বেরোতে চান না, এমন কি বিছানা ছেড়ে নামতেও চান না বিশেষ।

এই শীতের সকালে আগে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। এখন লেপের তলায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে ওঠেন সেই বেলা আটটায়, তাও এমনিতে নয়, পিসিমার তাড়নায়।

পিসিমা ব্রজবাসিনী দেবীর চেহারা রোগামতো, ছোটোখাটো, কিন্তু দাপট সাঙ্ঘাতিক। তাঁর দাপটে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। তাঁর স্বামী মস্ত শিকারী এবং কুস্তিগীর পরঞ্জয় দত্ত এ বাড়িতে জড়োসড়ো হয়ে বাস করেন। দুই ছেলে বিজয় এবং দুর্জয় মায়ের ভয়ে একেবারে কেঁচো। মহেন্দ্রচন্দ্রের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। এখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের ওপর তবু পিসিমার নির্দেশ মেনেই তাঁকে চলতে হয়, মহেন্দ্রচন্দ্রের স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদেরও একই অবস্থা।

ব্রজবাসিনীর দেবীর সবচেয়ে বড় দোষ তিনি মনে করেন সব মানুষেরই প্রচুর পরিমাণে খাওয়া উচিত। কেউ খেতে না চাইলে বা কম খেলেই তার মাথা গরম হয়ে যায়। আর তখনই বকবিকি চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। সুতরাং এ বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণীকে ব্রজবাসিনীকে সন্তুষ্ট রাখতে প্রাণপণে খেয়ে যেতে হয়। পরঞ্জয় দত্ত কুস্তিগীর মানুষ, খেতেও ভালবাসেন কিন্তু পয়ষট্টি বছর বয়সের পরেও যে সকালে তাকে উনিশটি করে পরোটা এবং তৎসহ চারখানা ডিম ও ছটা কলা খেতে হচ্ছে, এটাকে তিনি বাড়াবাড়ি মনে করেন। দুর্জয় আর বিজয়কে খেতে হয় বারোটা করে পরোটা আর তিনটে করে ডিম আর চারটে করে কলা। মহেন্দ্র চন্দ্রকে খেতে হয় পনেরোখানা পরোটা চারটে ডিম আর পাঁচটা কলা। সকালে এই বিপুল জলখাবারের পর দুপুরে আবার বিপুলতর আয়োজন। খেয়ে খেয়েই বোধহয় দুর্জয় আর বিজয়ের মাথামোটা হয়ে লেখাপড়া হল না। শরীর হল ঢোলের মতো। মহেন্দ্রচন্দ্রকে ঘোর আলসেমিতে

ধরে ফেলল। পরঞ্জয় অবশ্য কুস্তিটুস্তি করে। মগুর ভেজে কোনওরকমে নিজেকে এখনও ফিট রেখেছেন কিন্তু এ জিনিস চললে যে রক্তচাপ এবং অন্যান্য অসুখ দেখা দেবে তাতে সন্দেহ নেই।

মহেন্দ্রচন্দ্র সকাল সাড়ে ছটায় ঘুম ভেঙে লেপের তলায় একটু এপাশ ওপাশ করছেন। কাল রাত্রেও তিনি নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখেছেন, মনটা ভাল নেই, পেটে বায়ু আর শরীরের চর্বি বেশ বেড়ে যাচ্ছে দিনকে দিন। নড়চড়া করতে আজকাল ইচেছ যায় না ।

হঠাৎ তার কানে এল পিসিমা ব্রজবাসিনী একতলায় প্রচণ্ড চেঁচামেচি করছেন। ব্রজবাসিনী হামেশাই চেঁচামেচি করে থাকেন, সেটা এমন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়। কিন্তু আজকের চেঁচামেচির মধ্যে নতুন একটা খবর রয়েছে। ব্রজবাসিনী যেন চেঁচিয়ে কার নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা জানান দিচ্ছেন।

গাঁয়ে সদ্য একজন নিরুদ্দেশ হয়েছে এবং তার রেশ এখনও কাটেনি। এর মধ্যে আবার কে নিরুদ্দেশ হল তা বুঝতে না পেরে মহেন্দ্র আলস্য ত্যাগ করে লেপ ছেড়ে উঠলেন, গায়ে গরম চাদর জড়িয়ে ভেতর দিককার বারান্দায় এসে নিচের উঠোনে চেয়ে দেখলেন ব্রজবাসিনীকে ঘিরে দাসদাসী এবং আত্মীয়-স্বজনদের একটা ভিড়। ব্রজবাসিনী চিৎকার করে বলছেন, এ নিশ্চয়ই সেই ডাইনির কাণ্ড, জলজ্যান্ত লোকটা হঠাৎ উবে যায় কখনও?

মহেন্দ্র ওপর থেকে ঝুঁকে বললেন, কে উবে গেল পিসিমা? ব্রজবাসিনী ওপরের দিকে চেয়ে ডুকরে উঠে বললেন, ওরে তোর পিসেমশাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না |

কবে থেকে ?

আজই সকাল থেকে ।

মহেন্দ্র বিরক্ত হয়ে বললেন, এখনও তো ভাল করে সকালটা হল না, নিরুদ্দেশ যে হল তা বুঝলে কী করে?

বুঝতে কিছু বাকি নেই রে ।

পিসেমশাই তো সকালে উঠে রোজই জগিং করতে যান। হয়তো তাই গেছেন।

তাই যদি যাবে তো দু দুটো বন্দুকের বাক্স, অ্যাত বড় সুটকেস, তিন জোড়া বুটজুতো, তোষক বিছানা মশারি, দাড়ি কামানোর জিনিস এসব গেল কোথায়?

মহেন্দ্র খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, অ! তাই বলো ! পিসেমশাই তো তাহলে কোনও ট্যুরে গেছেন।

ট্যুরে গেলেই হল ? আমাকে না বলে যাবে—তার ঘাড়ে কটা মাথা?

হয়তো তোমাকে বললে যেতে দেবে না, তাই না বলেই গেছেন।

যেতে দেবো না সে তো সত্যি। কিন্তু তা বলে আমাকে না জানিয়ে যাবে এমন মানুষ সে নয়।

কখন গেল কিছু জানো ?

না রে। রাতে তো খেয়েদেয়ে এসে দিব্যি লেপমুড়ি দিয়ে শুলো, নাকও ডাকতে লাগল। সকালে উঠে দেখি, জলজ্যান্ত মানুষটা কর্পূরের মতো উবে গেছে।

ও পিসি, সাধু হয়ে যায়নি তো? সংসারের জ্বালায় কত মানুষ সাধু হয়ে যায়।

সাধু কি সঙ্গে বন্দুক নিয়ে যায় রে হাঁদারাম? নাকি তাদের সুটকেস বা বুটজুতোর দরকার হয়? তাদের তো কৌপীন, কমন্ডলু আর কম্বল হলেই হল।

সকালে কি ঘরের দরজা খোলা অবস্থায় দেখেছিলে? খোলা ছিল বলেই তো ভাবছি। তবে আর ভাববার কিছু নেই। পিসেমশাই গভীর রাতে সাধু হয়ে চলে গেছেন। কিন্তু সদর দরজাটা খুলে রেখে গিয়েছিলেন বলে পরে কোনও চোর এসে বন্দুক, বাক্স, বিছানা সব চুরি করে নিয়ে গেছে।

ওরে না না, এ সেইসব কাণ্ড নয়। এ হল অশৈলী ব্যাপার। শূলপাণিকে যে নিয়েছে তোর পিসেমশাইকে সে-ই নিয়েছে। তাকে চিরকাল দেখে এসেছি, কোনও কালে আমাকে না বলে এক পাও কোথাও যায় না। তেমন মানুষই নয়। বাক্স, বিছানা, বন্দুক এত সব জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া কি একজন মানুষের কাজ, বল তো !

সেই কথাই তো বলছি, পিসেমশাই ঝাড়া হাতপায়েই গেছেন, বাকি জিনিসগুলো চোরে নিয়েছে। দাঁড়াও থানায় একটা খবর পাঠাচ্ছি।

থানায় খবর গেল, পুলিশও এল। তার আগে এল গাঁ-শুদ্ধ লোক। নগেন দারোগা বলল, পরঞ্জয়বাবু রাশভারি সিরিয়াস মানুষ, এমন হঠকারিতা করবেন না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কোনও কাজ করে বসার মানুষ নন। সুতরাং তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে অন্য পক্ষের হাত থাকা বিচিত্র নয়।

গদাই চাপা গলায় বলল, পরঞ্জয়বাবু অবশ্যই নিরুদ্দেশ হতে পারেন।

কেন বলো তো?

ইদানীং তাঁর ব্লাড কোলেস্টোরাল ভীষণ বেড়ে যাচ্ছিল।

ব্লাড কোলেস্টোরাল বাড়লে কেউ নিরুদ্দেশ হয় নাকি ?

কিছু বলা যায় না।

নয়ন হাতি কপাল চাপড়ে খুব হাহাকার করতে লাগল। অত বড় একজন পালোয়ানকে যদি তুলে নিয়ে যেতে পেরে থাকে তাহলে আমাদের আর নিরাপত্তা কিসের? আমি ওকে ওস্তাদ বলে মানতাম, আমাকে একটা তিব্বতী প্যাচ শেখাবেন বলে কথা ছিল ।

জটেশ্বর বলল, আমি আর গোপেশ্বর কিছু বললেই পবনবাবুরেগে ওঠেন। তবু সত্যি কথা না বলেও পারছি না, ইদানীং পরঞ্জয়বাবু প্রায়ই শূলপাণির বাড়িতে যাতায়াত করতেন। এমন কি গত শনিবার সন্ধের মুখে শ্মশানকালীর মন্দিরের চাতালে বসে দুজনকে গভীর পরামর্শ করতেও দেখেছি।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

হরিপুরের নদীর ধারে সকালে বাজার বসেছে। হরিপুরের বাজারের বেশ নামডাক। তার ওপর আজ হাটবার হওয়ায় লোকে একেবারে লোকারণ্য।

গজানন হালুইকরের দোকানে বিখ্যাত সাড়ে সাত প্যাচের জিলিপি ভাজা হয়েছে। গন্ধে চারদিক ম ম, মানুষ ভেঙে পড়েছে দোকানের সামনে। আড়াই প্যাঁচের ফিনফিনে জিলিপি এ নয়। গজানন হাতের কায়দায় সাড়ে সাত প্যাঁচ এমন সুন্দর মিলিয়ে করে যে ছোট-বড় হওয়ার উপায় নেই।

জিলিপির লাইনে একটু পেছনের দিকে জগা আর পাগলু দাঁড়িয়ে পাছে লোকে চিনতে পারে সেই ভয়ে দুজনেরই মুখ বাঁদুরে টুপিতে প্রায় ঢাকা। তার ওপর গামছা জড়িয়ে মুখ এমন আবড়াল করেছে, যে চেনা লোকও চিনতে পারবে না।

জগা চারদিকে ভাটার মতো চোখে তাকাচ্ছিল, হঠাৎ চাপা গলায় বলল "ওই যে "

পাগলু জগার মতো নয়, তার চোখ ভাটার মতো ঘোরে না, বরং সবসময়ে একটা ঘুসঘুস ভাব। বলল, "কোথায় ?"

পেছনে বাঁ দিকে, পানের দোকানের আয়নায় গোঁফ চোমরাচ্ছে। গায়ে সবুজ জামা আর কালো পাতলুন।

পাগলু গম্ভীর গলায় বলল, "হুম "

"দেখেছ ?"

"দেখে নিয়েছি।"

"এখন কী করবে ?"

"চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। আমরা যে দেখেছি তা বুঝতে দিসনি।"

"ঠিক আছে। কিন্তু তোমাকে আগেভাগেই বলে রাখছি, আমার কিন্তু গজাননের সাড়ে সাত প্যাঁচের জিলিপি খাওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই। সকালে এককড়ি পান্তাভাত খেয়ে তার ওপর এক হাড়ি দই আর আঠারোটা সন্দেশ খেয়ে তবে এসেছি।"

পাগলু বলল, “পান্তাভাত খেয়েছিস সে বুঝলাম, কিন্তু দই আর সন্দেশটা সকালে কোথায় পেলি? লটারি মেরেছিস নাকি ?”

জগা মাথা চুলকে বলে, “আর বলো কেন, কাল সুধীর ঘোষের মেয়ের বিয়ে ছিল, জোগান সেজে ঢুকে পড়েছিলুম, যদি কিছু সরানো যায়। তা গয়নাগাটি পয়সাকড়ি কিছু তেমন জুটল না। শেষ অবধি দু হাড়ি দই আর দু বাক্স সন্দেশ নিয়ে পালিয়ে এসেছি।”

“ছোঃ, তোর নজর নিচু হয়ে যাচ্ছে জগা।”

“কী করব বলো, আমার কপালটাই ওরকম, এই তো সেদিন সনাতন সাহার বাড়িতে সিঁদ কেটে ঢুকে কী অবস্থা, সনাতনের এমন কাশি উঠল যে, বাড়ির লোক উঠে পড়ল, ডাক্তারবদ্যির খোঁজ হতে লাগল, আমি খাটের তলায় ঘাপটি মেরে বসে বসে মশার কামড় খেলাম । শেষে হাতের কাছে খানিকটা পুরনো তেঁতুল পেয়ে তাই নিয়েই পালিয়ে এলাম।”

ঘন ঘন মাথা নেড়ে পাগলু চলল “না না, তোর নজর নিচু হয়ে গেছে রে জগা। তোকে দিয়ে আর বড় কাজ হবে না।”

জগা মুখখানা বড্ড কাচুমাচু করে বলল, “ওরকম করে বোলো না গো পাগলুদাদা, বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে, ভাগ্যের চাকা একদিন ঘুরবে এই আশা নিয়েই তো বেঁচে আছি, তাই তো চিরকুটটা পেয়েই তোমাকে খবর দিয়ে এনেছি এখানে, এবার যদি দাও মারা যায় একখানা।”

“কিন্তু চিরকুটটায় কী লেখা ছিল তাই তো স্পষ্ট বলতে পারছিস না।”

“লেখাপড়া জানা থাকলে কি আর বলতে পারতাম না। অক্ষরজ্ঞানই যে নেই। তাই পাশের বাড়ির বিশেকে ডেকে পড়াতে হল।”

“এই সেরেছে। বিশে তো জেনে গেল তা হলে ; কথাটা যে পাঁচকান হয়ে যাবে।”

“আরে না, বিশে মোটে কেলাস ফোর-এ পড়ে, সে অত তালেবর নয়।”

“চিরকুটটায় ঠিক কী লেখা ছিল বল তো!"

“ওই তো বললুম, কাল হাটবার, গজাননের জিলিপির দোকানের সামনে থেকো। সবুজ জামা পরা একটা লোক আসবে। সে যেমন বলবে তেমনিই যদি করে তা হলে আখেরে লাভ হবে।”

“নিচে নাম সই ছিল?”

“না, এই দ্যাখে না কেন, আমার পেছনের পকেটেই তো রয়েছে চিরকুটটা ”

“পগলু উদাস মুখে বলল,” ও দেখে কী করব? আমিই কি পড়তে জানি?”

“তোমার কী মনে হয় বলে তো পাগলুদাদা? এতদিনে কি ভগবান মুখ তুলে চাইবেন?”

“ভগবানের তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই, এত লোক থাকতে তোর-আমার মতো অখদ্দে লোকের দিকে মুখ তুলে চাইবে, চিরকুটটা তো পেয়েছিস তোর ঘরের মেঝেয়। তা সেটা বাতাসে উড়ে জানালা দিয়ে এসেও তো পড়তে পারে। কে কাকে কী উদ্দেশ্যে লিখেছে কে জানে।”

“না গো পাগলুদাদা, তা নয়, যত্ন করে ভাঁজ করা কাগজ, জানালার নীচেই পড়ে ছিল, কেউ জানালা দিয়ে টুক করে ভেতরে ফেলে গেছে। দেখছ না পানের দোকানের সামনে সবুজ জামা গায়ে লোকটা দাঁড়িয়ে আড়ে আড়ে এদিকে দেখছে!”

“তুই তো একটা সবুজ জামা দেখেই কাত হয়ে পড়লি, আমি যে বিস্তর সবুজ জামা দেখছি। ওই তো হরুর সেলুনে খেউরি হচ্ছে এক সবুজ জামা, ওই দ্যাখ গোপালের দোকানে আর এক সবুজ জামা চটি সারাচ্ছে।”

“বটে!”

“বটে কী রে! ওই দ্যাখ এক সবুজ জামা এক বাচ্চা ছেলেকে বেলুন কিনে দিচ্ছে। আর এক সবুজ জামা তেলেভাজার দোকানে ওই দ্যাখ কেমন সাপটে বেগুনি গিলছে।”

“তাই তো পাগলুদাদা, এ যে দেখছি হাটভর্তি সবুজ জামা! আজ কি সবাই আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতেই সবুজ জামা পরে এল নাকি ?”

“তোরও বলিহারি যাই, কোথাও কিছু না, একটি চিরকুট কুড়িয়ে পেয়েই গুপ্তধন পাওয়ার মতো নেচে উঠলি। যাকগে গজাননের জিলিপির দুটো বারকোশ শেষ হয়ে এখন তিন নম্বরটা শুরু হবে। এবার আমাদের পালা।”

“তুমি খাও পাগলুদাদা, আমি একটু খোলা হাওয়ায় দাঁড়াই গিয়ে ”

“দাঁড়া"

জগা ভিড় ছেড়ে একটু তফাত হয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক সলুমালু করে চাইতে লাগল। বাস্তবিক জীবনে সে এত সবুজ জামা পরা লোক একসঙ্গে দেখেনি। আজ যেন চারদিকে সবুজের মিছিল।

পিরানের পকেটে ডান হাতে চিরকুটটা নাড়াচাড়া করতে করতে বেকুবের মতো জগা ভাবছিল, কেউ রসিকতা করল নকি ? কিন্তু সে এতই অপদার্থ লোক, এতই সামান্য যে, তার সঙ্গে রসিকতা করার লোকই বা কে হবে ?

একখানা ভারী হাত আচমকা গদার মতো তার বাঁ কাঁধে এসে পড়তেই জগার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়, কঁকিয়ে উঠে বলল, “আমি না .....আমি কিছু করিনি.....”

সেই গোঁফ কামানো লোকটা হাসি-হাসি মুখ করে বলল, “তুমি ছিচকে জগা না?”

জগা মিটমিট করে চেয়ে লোকটাকে দেখল। মস্ত লম্বা আর চওড়া বিভীষণ চেহারা, গায়ে সবুজ জামা ঠিক আছে। মাথায় বাবরি চুল, ডান হাতে লোহার বালা, ভগবান কি মুখ তুলে চাইলেন!

জগা ক্ষীণ গলায় বলল, “আজ্ঞে হ্যা।”

“তোমার মতো একজন ছিচকেকেই আমি খুঁজছিলুম।”

জগার বুকের মধ্যেটা তোলপাড় করে উঠল, হ্যাঁ এই তো সেই সবুজ জামা পরা লোক !

জগা খুব অমায়িক গলায় হাতটাত কচলে বলল, “আজ্ঞে কাজটা কী, বন্দোবস্তটা কীরকম হবে তা যদি একটু খোলসা করে বলেন, তা হলে বড্ড ভাল হয়।”

“খোলসা করে বলছি। গত চোত মাসে তুমি নয়ন লাহেড়ীর রান্নাঘরে হানা দিয়ে দুটো ডেকচি আর একটা কড়াই চুরি করেছিলে না?”

“যে আজ্ঞে, কিন্তু ওসব ছোটখাটো কাজ আর করব না বলেই ঠিক করেছি।”

“গত আশ্বিনে তুমি তারকনাথ দাসের গোয়ালঘর থেকে তাদের এঁড়ে বাছুর চুরি করে নবীগঞ্জের হাটে বেঁচে দিয়ে এসেছিলে।”

“আজ্ঞে তা হতে পারে।”

“তোমার ছিচকে চুরির যে লিস্টি আমার কাছে আছে তা বেশ লম্বা।”

জগা একটু লাজুক মুখ করে বলল, “ছোট ছোট কাজে হাত পাকিয়েছি বলে ধরে নেবেন না যেন যে, বড় কাজ পেরে উঠব না। বড় কাজ দিয়ে দেখুন কেমন নিখুঁতভাবে নামিয়ে দিই।”

“শোনো বাপু, তোমাকে যে কাজটা দিচ্ছি, তা নিতান্ত ছিচকে চোরের কাজ। ঠিকমতো যদি কাজটা উদ্ধার করে দিতে পারো তা হলে পঞ্চাশটা টাকা পাবে।”

“পঞ্চাশ!

মোটে পঞ্চাশ! কী বলছেন আজ্ঞে ?”

“ভুল শোনোনি, পঞ্চাশ টাকা কি খোলামকুচি নাকি?”

মাথা নেড়ে জগা বলে, “আজ্ঞে না, আমি আর ছুচে মেরে হাতগন্ধ করতে পারব না।”

“খুব পারবে । তোমার চুরির যে লিস্টিটা আমার সঙ্গে আছে তা যদি থানায় গিয়ে বড়বাবুর সামনে ফেলে দিই তাহলে তোমার ক' বছরের মেয়াদ হয় জানো

?”

“ভয় দেখাচ্ছেন কেন বলুন ত ! ছিচকে চোরেরা কি চিরকাল ছিচকে চোর থেকে যাবে? তাদের জীবনে কি উন্নতি করার সুযোগ আসবে না মশাই? চিরটা কাল যদি তাদের দাবিয়ে রাখেন তাহলে কি দেশের ভাল হবে?”

“আচ্ছা ঠিক আছে। পঞ্চাশের জায়গায় পুরো একশোই পাবে। হল তো !”

“আরে, একশো টাকাটাকা আজকাল কোনও টাকার মধ্যেই পড়ে না, আর একটু উঠুন। শয়ের জায়গায় হাজার করুন, কাজ করে দেব।"

লোকটা হঠাৎ অট্টহাস্যে গোটা হাট কাপিয়ে দিয়ে বলল, “হাজার ! অ্যাঁ! হাজার চাইছে ছিচকে চোর জগা?”

এরকম চেঁচিয়ে কথাগুলো বলায় জগা টক করে মুখ ঢেকে ফেলল। হাটে যদি চোর বলে লোকে চিনতে পারে তাহলে কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দেবে।

সে চাপা গলায় বলল, “দোহাই, চেঁচাবেন না, কাজটা কী?”

লোকটা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, “এখানে নয়, একটু তফাতে চলো।”

৭ম পরিচ্ছেদ

জগার কাঁধটা একরকম বাঘের থাবায় চেপে ধরে লোকটা তাকে খালধারে বাঁশঝোপের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল।

লোকটার ভাবগতিক জগার ভাল ঠেকছে না, সে চিঁ চিঁ করে বলল, ও মশাই এমন কি গোপন কথা যে অত আবড়ালে যেতে হবে। একটু খাটো গলায় বললেই তো হয়। হাটুরে গণ্ডগোলে গোপন কথা বলার ভারি সুবিধে। লোকটা তাকে একখানা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, নির্জনে আরও সুবিধে।

জগা ভয় খেয়ে বলল, যে আজ্ঞে।

খালের ওপর একখানা পুরনো নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। তার ওপারে বাবলাবনের ভেতর দিয়ে একখানা জঙ্গুলে পথ আছে বটে, কিন্তু লোকবসতি নেই। লোকটা জগাকে বাঁশের সাঁকোর মুখটায় এনে ফেলল, ঘাড়টা এমন চেপে ধরে আছে যে জগা অন্যরকম কিছু করতে পারছে না।

সে বলল, এবার বলে ফেলুন। লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠে বলল, বড্ড তাড়া দেখছি যে হে জগা ওস্তাদ। আমার হাত থেকে ছাড়া পেতে চাও নাকি ? তাহলে যা বলব মুখ বুজে করবে, নইলে বিপদ।

জগা চিঁচিঁ করে বলল, করবটা কী মশাই, সেইটে আগে বলুন।

শোনো জগা, কাজটা তোমার প্রথমটায় শক্ত মনে হতে পারে। তবে এ ধরনের কাজ প্রথমটায় শক্ত লাগলেও ধীরে ধীরে দেখবে সড়গড় হয়ে যাবে।

যে আজ্ঞে। মোটে একশ টাকায় শক্ত কাজ করা যে ভারি শক্ত হয়ে যাচ্ছে মশাই, তাও কাজটা কতটা শক্ত তা এখনও বলেননি।

কাজটা শক্ত বলেছি বুঝি? তা হবে, তবে তোমার কাছে হয়তো তেমন শক্ত নাও মনে হতে পারে।

কাজটা ক ? লোকটা একটু গলাটা নামিয়ে বলল, একজন বুড়ো মানুষকে বৈতরণীটা একটু পার করে দিতে হবে।

বৈতরণীটা পার করতে হবে? কথাটা ঠিক মাথায় যেন সেঁধোচ্ছে না মশাই|

বৈতরণী জানো না?

সে জানি, ওই তো মরার পর যে খালটা পেরোতে হয়।

বাঃ এই তো বুঝেছে।

না, ঠিক বুঝতে পারছি না আজ্ঞে।

বুড়ো মানুষটার বয়স নব্বইয়ের ওপর, কঞ্জুস লোক, টাকার পাহাড়ের ওপর বসে আছেন। এই মানুষটি ভবলীলা সাঙ্গ না করলে কিছু অসুবিধে দেখা দিচ্ছে। জগা হঠাৎ লোকটার প্রস্তাবের অর্থ বুঝতে পেরে চোখ কপালে তুলে বলল, আপনি কি খুন-খারাপির কথা কইছেন নাকি?

লোকটা চোখ একটু ছোটো করে চেয়ে বলল, তুমিই না একটু আগে বলছিলে ছিচকে চোর হয়ে থাকতে তোমার ঘেন্না করে। তুমি জীবনে উন্নতি করতে চাও, বলোনি?

জগা কাঁপতে কাঁপতে বলে, আজ্ঞে তা বলেছি, তবে খুন-খারাপি আমি পেরে উঠবো না। ও আমার পোষাবে না মশাই।

তাহলে যে তোমার কপালে দুঃখ আছে জগাইচাঁদ।

জগা লোকটার দিকে চেয়ে বলল, আমাকে ছেড়ে দিন। মেলা লোক পাবেন, আমাদের নিবারণ শীলই তো টাকা নিয়ে খুন করে বেড়ায়। তাকে ধরুন।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, উঁহু, আমার তোমাকেই দরকার।

জগা বলল, কিছু চিন্তা করবেন না মশাই, নিবারণ আমার পিসতুতো ভাইয়ের শালার পাশের গাঁয়ে থাকে। খুব চেনা লোক, দশ বিশ টাকা কমিয়েও দিতে পারব।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, নিবারণ নয়, কাজটা যে তোমাকেই করতে হবে জগাইচাঁদ।

আজ্ঞে, ও এলেম আমার নেই।

আছে কি না সেটারই পরীক্ষা হবে, শোনো জগা, কার ভেতরে কোন গুণ আছে তা আমার মতো কম লোকই বুঝতে পারে। আমি হলাম মানুষের জহুরী। তোমাকে দেখেই বুঝেছি, এই ছিচকে চোরের জীবন তোমার নয়। তোমার অন্যরকম জীবন হওয়া উচিত ।

জগা মলিন মুখ করে বলল, ওসব কি আমার সাধ্যি বাবু? ও আমি পেরে উঠব না।

একশো টাকার কথা শুনে হতাশ হয়ো না। একশো টাকাটা কথার কথা। কাজটা উদ্ধার যদি করে দাও, কোনওরকম গণ্ডগোল যদি না হয়, তাহলে পাঁচটি হাজার টাকা পাবে।

পাঁ... পাঁচ...

হ্যাঁ, পাঁচ হাজারই।

জগা তবু কাঁপতে কাঁপতে বলল, আজ্ঞে শুনে কাজ করার লোভও হচ্ছে, কিন্তু মনটা সায় দিচ্ছে না যে! বুকটা কাঁপছে।

লোকটা হাসল, বলল, আচ্ছা আচ্ছা, দশ হাজারই পাবে। এবার কাঁপুনিটা কমেছে?

জগা একটু নড়েচড়ে বলল, যে আজ্ঞে, বুকটা আর কাঁপছে না তো। যদি আরও পাঁচ হাজার দিই? জগা বুক চিতিয়ে বলল, আজ্ঞে কখন করতে হবে কাজটা ?

জিলিপি মাথায় উঠেছিল পাগলুর সে বড়বড় চোখ করে দেখছিল দশাসই লোকটার পাল্লায় পড়ে জগার কেমন বেড়ালের থাবায় ইঁদুরের মতো অবস্থা। বেগতিক দেখে পাগলু আর এগোয়নি। একটু ঘাপটি মেরে থেকে লক্ষ্য করল, লোকটা জগাকে খালধারে বাঁশঝোপের আড়ালে ঘাড়ে ধরে নিয়ে গেল। মারবে না কাটবে কে জানে বাবা, চেঁচামেচি করলে লোক জড়ো হবে বটে, কিন্তু সেটা তাদের পক্ষে ভাল হবে কি না কে বলতে পারে। গাঁয়ে মোটেই তাদের সুনাম নেই। লোক জড়ো হলে উলটে তারাই না হাটুরে কিল খেয়ে যায়।

পাগলুকে সুতরাং অপেক্ষা করতেই হল। ভরসার কথা, দশাসই লোকটার গায়ে সবুজ জামা, এই লোকই যদি চিঠি দিয়ে থাকে? তবে হয়তো মারধর করবে না |

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না পাগলুকে। কিছুক্ষণ পরেই দেখল জগা হাসিহাসি মুখে বেশ তরতরিয়ে এদিক পানে আসছে। সঙ্গে দশাসই লোকটা নেই।

রমেশের ছিটকাপড়ের দোকানের পাশে পাগলু ধরল জগাকে, কী রে, কখন থেকে তোকে খুঁজছি!”

“ওঃ পাগলুদাদা, মার দিয়া কেল্লা।”

“মেরেছিস।”

“তবে আর বলছি কী ? এই দেখ কড়কড়ে দুশো টাকা, চলো, জিলিপি খাই। আমার এখন খিদেটা চাগাড় দিয়েছে।”

পাগলু চোখ ছোটো করে গম্ভীর মুখে বলল, “দ্যাখ জগা, আমি একটু আগেই তোকে বলেছিলাম কি না যে, তোর নজর বড় ছোট হয়ে যাচ্ছে।”

জগা খ্যাঁক করে উঠে বলল, “কেন কেন, নজরটা ছোটো বুঝলে কিসে?”

“মাত্র দুশো টাকা পেয়েই বলছিস মার দিয়া কেল্লা ? একে ছোটো নজর বলে না তো কাকে বলে? দু-পাঁচ হাজার টাকার বরাত পেতিস তা হলে না হয় বুঝতাম, মাত্র দুশো টাকা পেয়ে কেউ এত লাফায়?”

উত্তেজিত জগা বেশ চড়া গলায় বলল, “দুশো টাকা কী বলছ গো ? বিশ লাখ টাকার বরাত পেয়ে এলাম আর দুশো বলছ? জগা কি ছোটোলোক নাকি গো পাগলুদাদা?”

পাগলু এমন আঁতকে উঠল যে, বাক্য সরতে চাইল না, বিশ লাখ কথাটা যেন জীবনে প্রথম শুনছে। মাথাটাও এক পাক ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে বলল, “কত বললি ?”

জগা অট্টহাসি হেসে বলল, “বিশ লাখ, বুঝলে ?

বিশ লাখ ” চারদিক থেকে লোকজন তাদের দিকে তাকাচ্ছে, পাগলু হঠাৎ জগার মুখটা হাতের চেটোয় চাপা দিয়ে ধরে বলল, “বুদ্ধ কোথাকার! এসব কথা চেঁচিয়ে বলতে আছে?”

জগা কাঁচুমাচু হয়ে চারদিকে চেয়ে গলা খাটো করে বলে “টাকাটা বড্ডই বেশি তো, তাই গলাটা আপনা থেকেই ওপরে উঠে গেছে।”

“আমারও মাথাটা কেমন পাক মারছে। খালি পেটে এসব উত্তেজক কথাবার্তা ভাল নয়। চ, আগে পেটপুরে জিলিপি খেয়ে নিই। তারপর পেট আর মাথা দুই-ই ঠাণ্ডা হলে একটু ফাঁকে বসে নিরালায় কথা হবে।”

“তাই চলো ”

“তা দুজনেই বেশ উত্তেজিত বলে খিদেটাও জম্পেশ রকমেরই হয়েছিল। ইয়া বড়বড় সাইজের জিলিপি এক-একজনে ত্রিশটা করে খেয়ে টিপকলে গলা অবধি জল গিলে মুখ মুছে হাটের বাইরে একখানা জামগাছের তলায় জুত করে বসল। তারপর পাগলু বলল, “এবার ধীরেসুস্থে বেশ গুছিয়ে বল।”

“এই সে-ই লোক, বুঝলে ?”

“কোন লোক ? যে চিঠি দিয়েছিল ?”

“তা আমি জিজ্ঞেস করিনি, তবে সে ছাড়া আর কে হবে ?"

“তা না হয় হল, কিন্তু বিশ লাখ টাকা দিচ্ছে, ব্যাপারটা তো সোজা নয়, কাজটাও গুরুতরই হবে। কাজের কথা কিছু বলল ?”

“সে কথায় আসছি। তার আগে একটা কথা ।”

“কী কথা বলে তো !”

“তুমি কি জানো যে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে ?”

“তা আর জানি না! এই হরিপুরের হাটেই কি দশ বছর আগে এত লোক হত? আজকাল গিজগিজ করছে মানুষ। পৃথিবীতে লোক বাড়ছে এটা সবাই জানে ।”

“সে কথা ঠিক। কিন্তু বাড়াটা উচিত হচ্ছে কি ?”

“সবাই তো বলে মোটেই উচিত হচ্ছে না। যত লোক বাড়বে ততই অভাব-অনটন বাড়বে, গণ্ডগোল বাড়বে, খেয়োখেয়ি বাড়বে |"

“তা হলেই বোঝো, দুনিয়াটা একদম উচ্ছন্নে যাবে যদি লোকের সংখ্যা আরও বাড়ে।”

“অত ঘুরিয়ে বলছিস কেন ? আসল কথাটা বলে ফেল ”

“সেই কথাতেই আসছি। তাড়াহুড়ো করতে নেই। গুছিয়ে না বলতে পারলে ব্যাপারটা তোমার মাথায় ঢুকবে না।”

“তা হলে গুছিয়েই বল, কিন্তু ঘুরিয়ে বলিস না বাপ ।”

“তা হলে শোনো, এই যে লোক বাড়ছে এটা যদি ভাল না হয় তা হলে এর উলটোটাই ভাল, কী বলো ?”

“তার মানে ?”

“ধরো, যদি লোক আর বাড়তে না দিয়ে যদি ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলা যায় তাহলে কেমন হয়?”

পাগলু চোখ সরু করে জগার দিকে তাকিয়ে বলল, “কমাবি? কেমন করে কমাবি?”

জগা উদাস গলায় বলে, “কাজটা যদি ভালই হয়, কমানোই যদি সাব্যস্ত হয় তবে তার জন্য যা করা দরকার তা করতে হবে ।”

মাথা নেড়ে পাগলু বলল, “কথাটা বুঝলুম না। আরও খোলসা করে বল ”

“ইয়ে মানে, বলছিলাম কি, ধরে যদি দুনিয়া থেকে কিছু লোকজন লোপাট করে দেওয়া যায় তাহলে কাজটা কি খারাপ হবে ?”

“লোপাট করবি কীভাবে ?”

"তোমার সঙ্গে কথা বলাটা বড্ড ঝকমারি হয়ে যাচ্ছে। এত কম বোঝো, কেন বলো তো ? বুদ্ধির গোড়ায় একটু জল দাও।"

পাগলু খুবই গম্ভীর হয়ে বলল, "বুঝতে যে একেবারে পারছি না তা নয়। কিন্তু যা বুঝেছি তা-ই তুই বলতে চাইছিস কি না সেটাও তো বোঝা দরকার "

"কী বুঝছ সেইটা আগে বলো।"

"তুই খুন-খারাপির কথা বলতে চাইছিস নাকি ?"

"আহা, খুন-খারাপ হিসেবে না ধরলেই তো হয়। ধরো, পৃথিবীর ভালই করতে চাইছি। একটা লোক কমে যাওয়া মানে হল একটা পেট কমল, একখানা ঘর, একখানা বিছানা খালি হল, শ্বাসের জন্য একটু অক্সিজেন বাঁচল। সব হিসেব করে দেখলে দেখবে, ব্যাপারটা যত খারাপ শোনাচ্ছে ততটা খারাপ নয় ।"

"পাগলু থমথমে মুখ করে বলে, "লোকটা তোকে কী প্রস্তাব দিয়েছে সেটা আমাদের বাংলা ভাষায় বলতো বাপ । বাবু ভাইদের মতো সোজা কথাকে প্যাচে ফেলিস না ।"

জগা একটু চুপ করে থেকে বলল, "কাজটা খুবই সোজা। মহামায়াতলায় একজন বুড়ো মানুষ আছেন, বয়স তা ধরো পঁচানব্বই-ছিয়ানব্বই হবে। খুব কঞ্জুষ লোক, তা এই লোকটিকে বৈতরণী পার করিয়ে দিতে হবে। তা হলেই হাতে একেবারে কড়কড়ে বিশ হাজার—"

"হাজার? এই না বিশ লাখ বললি?"

"বলেছি ! পাগলুদাদা, আমাদের কাছে হাজারে আর লাখে তফাত কী বলো তো ! কত টাকায় হাজার হয় তা-ই তো আজ অবধি জানলুম না। বললে ভুলই বলেছি। লাখ নয়, হাজার "

একটা শ্বাস ফেলে পাগলু বলল, "তার মানে লোকটা তোকে খুনের কাজে লাগাতে চাইছে।"

"আহা, খুনটুন বললে ভাল শোনায় না পাগলুদাদা।"

"কেমন শোনায় জানি না। কিন্তু কাজটা খুনই, শোন, তোর সঙ্গে অনেক দিনের সম্পর্ক। তোকে ছোট ভাইয়ের মতো দেখি। কিন্তু তোর মাথায় যদি এসব পাপের চিন্তা ঢোকে তা হলে আর তোর ছায়াও মাড়াব না।"

জগা কাচুমাচু হয়ে বলে, "তা হলে কি চিরটা কাল ছিচকে চোরই থেকে যাবো পাগলুদাদা? জীবনে উন্নতি করতে পারব না ?"

"চোর থেকে খুনি হওয়া কি উন্নতি রে পাগল ? তোর ধর্মে কী বলে?"

"ফস করে ধর্মের কথা তোলো কেন বলে তো !"

"ধর্ম বলে একটা ব্যাপার আছে, তাই বলি, চুরিও অধর্ম কিন্তু জীবহত্যা ওরে বাপ রে !"

"হাসালে পাগলুদাদা। জীবহত্যা যদি পাপ হবে তবে পাঁঠা কাটলে, মাছ মারলে, মশা মারলে যা পাপ মানুষ মারলেও তার বেশি পাপ হওয়ার কথা নয় ।"

পাগলু কাহিল মুখে একটু হেসে বলল, "তোর বুদ্ধি খুব খুলেছে রে জগা। বেশ বলেছিস । কিন্তু আমি ওর মধ্যে নেই। তোকে বলি, তুইও থাকিস না। মশা মারলে ফাঁসি হয় না। কিন্তু মানুষ মারলে হয়, এটা তো মানিস !"

"ফাঁসি হয়, ধরা পড়লে, ধরা না পড়লে কিছু হয় না।"

"ধরা পড়বি না কে বলতে পারে ?"

"ভেবে দেখতে হবে ।"

"লোকটাকে খুন করতে চায় কেন এই লোকটা ?"

"তা অত খোলসা করে বলেনি। আন্দাজ করছি, বুড়ো মানুষটা এর মামা বা কাকা গোছের কেউ হয়। সে মারা গেলে এ-লোকটা সম্পত্তি পাবে।"

"বটে ! তা দেশে কি খুনির অভাব? টাকা ফেললেই কত লোক গিয়ে খুন করে আসবে। লোকটা তোকে এ-কাজের জন্য বাছল কেন ?"

"আমার মধ্যে নাকি মস্ত বড় হওয়ার মতো গুণ আছে। সেই দেখেই।"

"তোর মাথা ।"

"তা হলে কী ?"

"বলব ? বললে বিশ্বাস করবি ?"

"বলেই দ্যাখো না ।"

"খুন যদি তুই করিসও লোকটা তোকে ফাঁসিয়ে দেবে। একটি পয়সাও আর পাবি না। উলটে ধরা পড়ে ফাঁসিতে যাবি। লোকটা তোকে বলির পটা করেছে।"

শুনে একটু ছাইবর্ণ হয়ে গেল জগা, বলল, "তাই নাকি পাগলুদাদা ?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু কাজটা যদি না করি তা হলে যে লোকটা পুলিশের কাছে যাবে। তার কাছে আমার সব অপকর্মের একটা ফর্দ আছে।"

"তা থাক। তুই বরং পালা।"

"পালাব ! কোথায় পালাব ?"

দু'জনের যখন এরকমতরো কথা হচ্ছে, কারোই কোনও দিকে খেয়াল নেই, তখন হঠাৎ পেছনের বাবলা ঝোপের আড়াল থেকে বেঁটেখাটো একটা লোক

বেরিয়ে এসে বলল, "ওঃ, তোমাকে খুঁজে খুঁজে যে হয়রান হলাম হে জগা !"

লোকটার গায়ে সবুজ জামা। দুজনে হাঁ করে চেয়ে রইল ।

৮ম পরিচ্ছেদ

গোপেশ্বরকে দেখে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। হরিপুরে আজ হাটবার, আর হাটবারে কে না হাটে আসে। তবে জগা আর পাগলু একটু ঘাবড়ে গেছে, যদি গোপেশ্বর তাদের কথাবার্তা শুনে থাকে! খুন-খারাপ নিয়ে কথাবার্তা তো ভাল নয়।

গোপেশ্বরের মুখ দেখে তার মনের ভাব বুঝবার উপায় নেই। ভারি অমায়িক মুখে মিষ্টি একটু হাসি। মোলায়েম গলায় বলল, "তা ভায়াদের যে মুখ বড় শুকনো দেখছি! এ তো ভাল কথা নয়। মায়াবদ্ধ জীব তো মনের ঘানিতে ঘুরবেই। বেঁচে থাকা মানেই পাকে-পাকে জড়িয়ে পড়া। তা কথাটা হচ্ছিল কী নিয়ে?"

জগার মুখে বাক্য সরল না। পাগলু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, "এই দ্রব্যগুণ নিয়েই কথা হচ্ছিল আজ্ঞে।"

"দ্রব্যগুণ ! বলো কী হে? দ্রব্যগুণ নিয়ে তো মাথায় ঘামায় রামহরি কবিরাজ।"

পাগলু জিভ কেটে মাথা চুলকে বলল, "আজ্ঞে মুখ্যুসুখ্য মানুষ, কী বলতে কী বলে ফেলি! দ্রব্যগুণ বলতে জিনিসপত্রের দামের কথাই হচ্ছিল আজ্ঞে। কুমড়োর দাম কী চড়াটাই চড়েছে বলুন ত ! মুলো বলুন, শাকপাতা বলুন, কোনটা গরিবের নাগালে আছে বলতে পারেন?"

"তা বটে। তা হলে দ্রব্যগুণ নিয়েই কথা হচ্ছিল তোমাদের?"

"যে আজ্ঞে ।"

"আমার বয়স হয়েছে। কানেও ভাল শুনি না। তবে যেন ঝোপের আড়াল থেকে মনে হল, কারা যেন খুন-খারাপ নিয়ে কথা কইছে।"

পাগলু একগাল হেসে বলল, "খুনই তো, খুন ছাড়া একে আর কী বলা যায়? এই জগা বলছিল, 'পাগলুদাদা, জিনিসপত্রের যা গলাকাটা দাম দেখছি এতে গরিবেরা সব খুন হয়ে যাবে।"

"বটে ! তা ঠিক কথাই তো !"

"আজ্ঞে, নিয্যস কথা। তা আপনি কিছু কইবেন?"

"গোপেশ্বর মিষ্টি হাসিটি বজায় রেখেই বলল, "সেইজন্যেই তো হাটময় খুঁজে বেড়াচ্ছি তোমাদের হে। এসো, এই গাছতলায় জুত করে বসি। কথা আছে "

“জগা খুবই ভয় পেয়েছে। বসতে গিয়ে সে দেখল তার হাতে-পায়ে খিল ধরে কেমন শক্ত হয়ে গেছে। হাঁটু ভাঁজ হতে চাইছে না। সে বলল, “আপনারা কথা বলুন, আমি একটা কচু দর করে এসেছি, দেখি গিয়ে সেটা আবার কেউ নিয়ে গেল নাকি।”

গোপেশ্বর মিষ্টি গলায় বলল, “কচুর জন্য ভাবন কী হে? আমার বাড়ির পেছনেই মেলা হয়েছে। দাম দিতে হবে না, অমনি দিয়ে দেবখন তোমাকে একটা, আর কথাটাও তোমার সঙ্গেই কিনা।”

জগা বলল, “আজ আমার সঙ্গে অনেকেরই কথা আছে দেখছি।”

গোপেশ্বর মাথা নেড়ে বলে, “যা বলেছ, মানুষ নিজের গুণেই বড় হয় কিনা! আর বড় হওয়ার ওইটেই রাজলক্ষণ। তখন সবাই তাকে খোঁজে, একটু আগেই তো দেখছিলাম যেন একজন লম্বা দশাসই চেহারার লোক খালধারে দাঁড়িয়ে তোমার কাঁধে হাত রেখে কথা কইছিল!”

জগার হাত-পায়ের খিল খুলে গেল লহমায়। সে অবশ হয়ে ধপ করে বসে পড়ল মাটিতে। মুখে বলল, “কই না তো!"

“আমার চোখের দোষও হতে পারে। বয়স তো বড় কম হল না হে। চোখ-কানের আর দোষ কী? মনে হল যেন মথুরাপুরের দিনুকেই দেখলুম। না হলেই মঙ্গল, কারণ দিনু তো খুব একটা ভাল লোক নয়।”

জগা কাহিল গলায় বলে, “দিনু কে মশাই ?”

গোপেশ্বর মাথা মৃদু-মৃদু ডাইনে-বাঁয়ে নেড়ে বলে, “না না, ভুলই হয়েছে বলে ধরে নাও, দিনুর তো এখানে হাজির হওয়ার কথা নয়। তার নামে চৌদ্দটা খুনের মামলা ঝুলেছে। কয়েদ আছে আজ প্রায় সাত মাস। ফাঁসি তার হবেই। সে এখানে আসবে কী করে?”

জগা হাঁ হয়ে গেল। “দিনু? দিনু মানে যদি দিনু হালদার হয়ে থাকে, তা হলে যে সর্বনাশ! মথুরাপুরের দিনুর নামে পুলিশ দারোগারও কম্প ওঠে।”

পাগলু একটু ক্ষীণ গলায় বলল, “আর যদি ভুল না দেখে থাকেন? যদি লোকটা দিনুই হয়ে থাকে?”

গোপেশ্বর একটু গম্ভীর হয়ে বলে, “তা হলে বড় ভয়ের কথা হে ভায়া বড়ই ভয়ের কথা। দিনু যদি কাউকে ধরে তবে তার রক্ষে নেই। কিন্তু সে তো এখন হাজতে—চোখের ভুলই হবে ।”

জগা কচুমাচু হয়ে বলে, “আমার কিন্তু দোষ নেই মশাই। আমি হাটে কচুর দর করছিলুম। এমন সময়ে ঘটোৎকচের মতো লোকটা এসে আমাকে ধরল। আমি দিনু হালদারকে কস্মিনকালেও চিনি না।”

গোপেশ্বর জিভ দিয়ে একটা চুকচুক শব্দ করে বলল, “আহা, দোষটা তোমাকে দিচ্ছে কে? হাটে হাজারো লোক আসে, কে ভাল কে মন্দ তা চেনা কি চাট্টিখানি কথা? তবে লোকটা তোমাকে বলছিল কী?”

মাথা নেড়ে জগা বলল, “সে আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না।”

“তা হলে তো বড়ই দুঃখের কথা ভায়া। স্মরণ না হলে যে অনেক সময়ে ব্যাপার কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কুশল প্রশ্নই করছিল নাকি ষণ্ডাটা?”

আজ্ঞে তাও হতে পারে। খিদের চোটে তখন আমার মাথাটা ভাল কাজ করছিল না কিনা। কী সব যেন বলছিল।”

গলাটা যেন আরও মেজে ঘষে, আরও মোলায়েম করে গোপেশ্বর বলল, “কথাটা কী জান ? একটা কানাঘুষো যেন শুনছিলাম দুদিন আগে। কুসুমপুরে এক যজমান বাড়িতেই যেন শুনছিলুম, পাঁচজন বলাবলি করছে, দিনু হালদার গরাদ ভেঙে পালিয়েছে। তখন কথাটা বিশ্বাস হয়নি।”

পাগলু বলল, “আরও একটু খোলসা করে বলুন বাবাজি।”

গোপেশ্বর নিমীলিতনয়নে কিছুক্ষণ দুয়ের দিকে চেয়ে থেকে বলল, “পাপে পৃথিবীটা একেবারে ভরাভর্তি হয়ে গেল হে।”

“আক্তে যা বলেছেন, পাপ ছাড়া আর আছেটাই বা কী ? তা দিনু হালদারের বৃত্তান্তটা কী বাবাজি?”

“যে মুখে হরিকথা কই, সেই মুখে এসব কথা কইতে বড় ঘেন্না হয় হে।”

“আজ্ঞে তা তো বটেই।”

“দিনুর তিনকুলে থাকার মধ্যে আছে এক মামা। দাসপুকুরে বাড়ি। একসময়ে অবস্থা ভালই ছিল। এখনও নেই-নেই করে ধরে তো প্রায় লাখ বিশেক টাকার সোনাদানা আছে। ওয়ারিশ আছে মেলাই। হরিপদ দাসের নিজের ছেলেপুলে নেই, স্ত্রীও গত হয়েছে কয়েক বছর। মরলে সম্পত্তি পাওয়ার কথা তার ভাইপোদের। কিন্তু মুশকিল হল, হরিপদর অত সোনাদানা কোথায় আছে তার হদিস কেউ জানে না।"

জগার চোখ দুটো একটু জ্বলজ্বল করে উঠল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “লুকিয়ে রেখেছে নকি?”

“চারদিকে চোর ডাকাতের যা উপদ্রব, না লুকিয়ে উপায়ই বা কী বলো!”

জগা বলল, “তা বটে।”

গোপেশ্বর বলল, “হরিপদ দাসের বিরাট বাড়ি, খুবই পুরনো। সেই বাড়ির একতলায় হরিপদ দাস একখানা মস্ত ঘরে থাকে। লোকের বিশ্বাস, ওই ঘরেই সোনাদানা সব আছে। কিন্তু হরিপদ কস্মিনকালেও সেই ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় না। নিজেও ঘরের বাইরে বড় একটা আসে না। তার সাত-আটটা শিকারি কুকুর আর গোটা দশেক হলো বেড়াল আছে। আর আছে বাহাদুর নামে একজন পুরনো বিশ্বাসী কাজের লোক। তারাই বাড়ি পাহারা দেয়। কাকপক্ষীও ঢুকতে পারে না।”

জগা ফস করে বলল, “হরিপদবাবুর বয়সটা কিরকম হল বলতে পারেন?”

“তা পারি। চুরানব্বই পুরে এই পঁচানব্বই না। তবে বুড়ো বলে জরাজীর্ণ ভেবো না। হরিপদ দাস এখনও বেশ সক্ষম মানুষ। দাঁত পড়েনি, চুলও পাকেনি। শোনা যায়, এখনও নাকি সকালে মুগুর ভাঁজেন। হেসেখেলে একশো পেরোবেন। আর সেইজন্যই দিনু কিন্তু বড় উতলা হয়ে পড়েছে।”

পাগলু বলল, “কারণটা কী ?”

“মামা মরলেও তার কোনও আশা নেই। কারণ আইনত সে সম্পত্তি পায় না। সে ফিকির করছে মামাকে যদি দুনিয়া থেকে সরাতে পারে তা হলে সোনাদান গাপ করা সহজ হয়। বলে রাখি ভায়ারা, দিনু বড় পাপী লোক।”

পাগলু বলে ওঠে, “যে আজ্ঞে, সে আর বলতে।”

“আর একথাটাও জেনে রাখো, হরিপদ দাসও বিশেষ ভাল লোক নয়। সুদখোর মানুষ, চিরকাল গরিবকে ঠকিয়ে টাকা করেছে। কত বিধবার শেষ সম্বল যে ঠকিয়ে নিয়েছে তার লেখাজোখা নেই। দিনুর উপযুক্ত মামাই বটে। একেবারে শঠে শঠ্যাং । আমি বলি কী, দিনু যদি তার মামাকে মারতেই চায় তো মারুক। কিন্তু তোমরা ওর মধ্যে থেকে না।”

জগা বলে উঠল, “আজ্ঞে না। কখনওই না।”

“শোনো বাপু, দিনুর বৃত্তান্ত বলতে আমার আসা নয়। আমার আরও কিছু কথা আছে।”

পাগলু বলে, “কী কথা বাবাজি ?”

“কথা শূলপাণিকে নিয়ে।”

৯ম পরিচ্ছেদ

গোপেশ্বরের মুখে শূলপাণির নাম শুনে জগা আর পাগলু একটু মুখ তাকাতাকি করে নিল। তারপর পাগলু খুব অমায়িক গলায় বলল, “আজ্ঞে কথাটা কী?”

গোপেশ্বর ততোধিক অমায়িক মোলয়েম গলায় বলল, “আহা, পাগল মানুষটাকে যে কে গুম করে ফেলল! তোমরা জানো নাকি কিছু ভায়ারা?”

দুজনেই সমস্বরে বলে ওঠে, কিছু না। কিছু না।

গোপেশ্বর মৃদু হেসে বলল, জ্ঞানের চেয়ে অজ্ঞানতাই কখনও সখনও ভাল বলে মনে হয়. যত না জানা যায় ততই বিপদের ভয় কম, কে আর ঝঞ্ঝাটে জড়াতে চায় বলো!

দুজনেই বলল, ঠিক কথা। তবু জিজ্ঞেস করছি কেন বলো? তোমরা দুটি তো সব বাড়িতেই রাতবিরেতে হানা দাও। অনেক সময়ে আড়ি পেতে ভেতরকার গুহ্য কথাও শুনে ফেল। অনেকের হাঁড়ির খবর তোমাদের একেবারে নখদর্পণে । তাই না?

জগা লজ্জিত হয়ে ঘাড়টাড় চুলকে বলে, না না, কী যে বলেন। সামান্য মানুষ আমরা।

গোপেশ্বর মাথা নেড়ে বলে, আহা, অত বিনয় করতে হবে না। তোমরা যে কাজের লোক তা আমি ভালই জানি।

যে আজ্ঞে। শোনো ভায়ারা, শূলপাণি হঠাৎ যেন গায়েব হয়ে গেল সেই কথাটা আমার জানা দরকার।

পাগলু মাথা নেড়ে বলে, আজ্ঞে আমরা কাজটা করিনি। ছোটোখাটো চুরি-ছ্যাচড়ামি করে থাকি বটে, কিন্তু গুম বা খুনটুন আমাদের লাইনের ব্যাপার নয়।

কাজটা যে তোমরা করেছে এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বলছি কি, শূলপাণির ঘরে কখনও হানাটানা দিয়েছে?

জগা বলল, আজ্ঞে না। ওখানে গিয়ে হবেটা কী? শূলপাণি পাগল মানুষ, কুকুর-বেড়াল নিয়ে থাকত, তার বাড়িতে হানা দিয়ে হবে কোন লবডঙ্কা ?

তা বটে। কিন্তু শূলপাণি যে নিয্যস পাগল একথাটা আমার প্রত্যয় হয় না। আমার বরাবরই মনে হয়েছে শূলপাণি একজন সাজা পাগল।

পাগলু অবাক হয়ে বলে, বটে ! তাহলে তো আপনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখেন।

খবর তুমিও বড় কম রাখো না।

পাগলু একটু তেড়িয়া হয়ে বলে, তার মানে?

মানে আমার চেয়েও তোমাদের আরও বেশি খবর রাখার কথা। তোমাদের দুজনেরই শূলপাণির বাড়িতে রীতিমতো যাতায়াত ছিল। আমার স্বচক্ষে দেখা। অস্বীকার করে লাভ নেই।

জগা আর পাগলু ফের একটু মুখ তাকাতাকি করে নেয়। তারপর পাগলু গলাটা একটু নামিয়ে বলে, সে ঠিক কথা, আমরা ভাবতুম সে মস্ত ম্যাজিসিয়ান, কোন বিপদে কখন কোন কাজে লাগে কে জানে। তাই ম্যাজিক শিখতে কিছুদিন যেতুম বটে।

শূলপাণি তোমাদের কী ম্যাজিক শেখাতো?

জগা রেগে উঠে বলল, কিছু না মশাই, কিছু না। আমরা গেলেই সে অংবং করে কী সব বলত, মুখ ভাঙাতো, অঙ্গভঙ্গি করত, দু-চারবার ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়াও করেছে।

বটে, এ তো খুব অন্যায় কথা!

অন্যায় বলে অন্যায় ! তাকে খুশি করার জন্য ধারকর্জ করে বনমালীর তেলেভাজা, আসগরের চপ, গোবিন্দপুরের দৈ কতবার ভেট নিয়ে গেছি। তা উনি সেসব বেশ জুৎ করেই খেতেন, কিন্তু শেখানোর বেলায় লবডঙ্কা।

কিন্তু বাপু, কথাটা হল সে যে ম্যাজিক জানে একথাটা তোমাদের বলল কে?

জগা মাথা চুলকে বলল, অনেকেই বলাবলি করত, ওরকম ধারা খ্যাপাটে মানুষেরা কিছু না কিছু গুপ্তবিদ্যে জানেই মশাই, হাটে-বাজারে লোকে বলাবলি করত শূলপাণি নাকি রাত-বিরেতে পাখির মতো আকাশে উড়ে বেড়ায়, তার বাড়িতে নাকি জিন-পরি-ভূতপ্রেত নিত্যি আসা-যাওয়া করে।

তুমি নিজে কি কিছু দেখেছে?

মাথা নেড়ে জগা বলে, না মশাই, আমাদের যে কিছু দেখাত না। আমরা গেলেই পাগল সাজত।

আচ্ছা, একটা কথা।

বলুন।

রাত আটটার সময় শূলপাণি যে অট্টহাসিটা হাসত সেটা কখনও শুনেছো ?

শুনব না? রোজ শুনতুম। গাঁশুদ্ধ লোকও শুনত।

যে সময়ে সে হাসত সে সময়ে কখনও তার কাছে ছিলে?

যে আজ্ঞে |

কি রকম ভাবে হাসত একটু বলবে?

আজ্ঞে সে বড় বিদঘুটে হাসি। শুনে পিলে চমকে যেত। প্রথম দিন ওই হাসি শুনে তো আমার মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়।

কেন হাসত তা জানো?

আজ্ঞে না ।

কখনও জিজ্ঞেস করেছিলে?

তা করেছিলুম। প্রথম দিন যখন সন্ধের মুখে তাঁর কাছে যাই তখন খানকতক গরম গরম জিবেগজা নিয়ে গিয়েছিলুম। তা উনি জিবেগজা খেতে খেতে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিলেন। চোখ দুটো আধবোজা, একটু একটু দুলছেন বসে বসে। আমি হাতজোড় করে সামনেই বসে আছি। হঠাৎ যেন ভূমিকম্পের মতো কী একটা হয়ে গেল। বললে বিশ্বাস করবেন না। ঠিক যেন নাভি থেকে শব্দটা ওঁর গলায় উঠে এল। এমন দমকা লহর তোলা হাসি জীবনে শুনিনি বাবা। ভিরমি খেয়েছিলাম মনে আছে। তারপর চেতন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, বাবাজী, এটা কী হল ?

তা উনি কী বললেন ?

বলাটলার ধার ধারতেন নাকি? শুধু একবার কটমট করে তাকালেন।

কেন হাসত তা ঠাহর করেছে কখনও?

মাথা নেড়ে জগা বলল, আজ্ঞে না !

তোমরা কি জানো যে শূলপাণি একেবারে ঘড়ি ধরে ঠিক রাত আটটার সময়ে হাসিটা হাসত, কখনও এক চুল এদিক-সেদিক হত না?

পাগলু বলল, আজ্ঞে সেরকমই শুনেছি। কিন্তু আমাদের তো আর ঘড়ি নেই যে মিলিয়ে দেখব।

গলাটা আরও এক পর্দা নামিয়ে গোপেশ্বর বলল, আরও একটা কথা ভায়ারা। শূলপাণির বাড়ি থেকে নাকি লাল নীল সবুজ ধোঁয়া বেরোতো তোমরা দেখেছো নাকি?

দুজনেই মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে না।

আচ্ছা, ধোঁয়া নয় না-ই দেখলে, আর কিছু দেখনি? চোখে লাগে এমন কিছু?

জগা ফস করে বলে ওঠে, অনেকক্ষণ ধরে বকাচ্ছেন মশাই। আমাদের তো সময়ের একটা দাম আছে।

গোপেশ্বর ভারি অমায়িক হেসে বলে, তা আছে ভায়ারা, তা অবশ্যই আছে। একটু আগেই যেন দেখলুম। আমাদের জগা ভায়া দিনুর কাছ থেকে কড়কড়ে দুশো টাকা পে ! তা সেটাও কি ওই সময়েরই দাম নাকি?

জগা একটু দমে গেল। বলল, ঠিক আছে, যা জিজ্ঞেস করার করুন, তবে সময় বেশি নেবেন না। বেলা চড়ছে, আমাদের বিষয়কর্ম পড়ে আছে কিনা।

জানি বাপু, তুমি বড্ড কাজের লোক। তা বলি কখনও শূলপাণির কাছে কাউকে যাতায়াত করতে দেখনি?

তা দেখব না কেন? শূলপাণি বাবাজীর কাছে সবাই যেত। এমন কি গোঁসাই, আপনিও যেতেন। কতদিন দেখেছি আপনি আর জটেশ্বরদাদা মুড়িসুড়ি দিয়ে গভীর রাতের দিকে বাবাজীর ডেরায় গিয়ে সেঁধোচ্ছেন।

আহা, আমরা গাঁয়ের লোক, তার ভালমন্দের খোঁজ নিতে যেতুম আর কি ! আমাদের কথা হচ্ছে না। বাইরের কেউ আসত? অচেনা মানুষজন?

তাও আসত। তবে কার কথা জানতে চান সেইটে খোলসা করে বলুন।

ইয়ে ধরে যদি বলি একজন খুব বেঁটেখাটো লোক?

জগা আর পাগলু ফের মুখ তাকাতাকি করে নেয়। জগা বলল, তা নানা সাইজেরই আসত। বেঁটে, লম্বা, মোটা, রোগা, কালো, ধলা।

আমি একজন বিশেষ বেঁটে লোকের কথা বলছি।

পাগলু বলল, বড্ড খিদে পেয়ে গেল যে গোঁসাই ! এই অবস্থায় তো কথা চলে না।

গোপেশ্বর গম্ভীর হয়ে বলে, তাই বুঝি? বলি কথাটা ভাঙবার জন্য ঘুষ চাও নাকি? ঠিক আছে, দিনুর কাছ থেকে যে টাকা খেয়েছো সেটা নগেন দারোগার কানে তুলে দেবোখন। নগেন দারোগা রিটায়ার করলে কী হয় এখনও পাপীতাপীর যম।

পাগলু খিক করে একটু হেসে বলল, সে আপনার ইচ্ছে হলে বলুন গে। আর ইদিকে আমরাও কথাটা একটু দিনুর কাছে নিবেদন করে দেবোখন যে, আপনি আমাদের ভয়টয় দেখাচ্ছেন।

গোপেশ্বর গম্ভীর হয়ে বলল, প্যাচ কষছে ভায়ারা?

তা আপনি কষলে আমাদেরও কষতে হয়।

গোপেশ্বর ফের মোলায়েম হয়ে বলে, দারোগাবাবুকে বলে দেবো বলেছিলাম, তা সে কথাটা ধোরো না। আসলে কী জানো, খবর পেয়েছি। একটা বেঁটেমতো লোক শূলপাণির কাছে খুব যাতায়াত করত। শূলপাণির গুম হওয়ার পেছনে তার হাত থাকতে পারে।

জগা বলল, গুমটুম বাজে কথা। শূলপাণি বাবাজীর আর এখানে পোষাচ্ছিল না, তিনি হিমালয়ে গিয়ে সাধু হয়েছেন বলেই লোকের বিশ্বাস।

গোপেশ্বর খানিকক্ষণ চিন্তিতভাবে বসে থেকে হঠাৎ বলল, জিলিপি খাবে নাকি ভায়ারা? তা এই নাও পাঁচটি টাকা। আমি গরিব মানুষ, এর বেশি পেরে উঠব না। এতে কি হবে?

জগা ঘাড় হেলিয়ে বলল, হয়ে যাবে কোনওরকমে, কী বলো পাগলুদাদা ?

পাগলু বিরক্ত হয়ে বলল, তোর বড্ড ছোটো নজর রে জগা। আহা বেষ্টম মানুষ, যা দিচ্ছেন নিয়েই নাও।

পাগলু অনিচ্ছুক হাতে টাকাটা নিয়ে ট্যাকে গুজে বলল, বেঁটে লোকটাকে আপনার কিসের দরকার?

বেঁটে বলে তাকে অবহেলা কোরো না ভায়ারা। তার নামে একটা তল্লাট কাঁপে। ছোটোখাটো মানুষ হলে কি হয়, সে হল অ্যাটম বোম। তার নাম হল নিতাই পাল। চেনো ?

একগাল হেসে পাগলু বলল, নিতাই পালকে চিনব না! তবে তিনি যে এত ভয়ঙ্কর লোক তা জানা ছিল না। .

অনেক কিছুই তোমাদের জানা নেই ভায়া।

তা নিতাই আসত?

প্রায়ই আসতেন। কী সব গুজগুজ ফুসফুস কথাও হত দুজনের মধ্যে।

বটে !

আজ্ঞে । সাতগাঁ না কোথায় যেন বাড়ি।

সাতগাঁয়েই।

আপনি কি তাকে চেনেন গোঁসাই?

চিনি মানে ওই আর কি। মুখ চেনা বলতে পারো। কথাটা হল, নিতাই পালকে একটু ফিট না করলেই নয়। তাকে চেপে ধরলে শূলপাণির খবর পাওয়া যাবে। আর শূলপাণির খবর পেলে সরলাবুড়ির গুপ্তধনেরও হদিস মিলবে।

জগা হেসে উঠে বলল, গোঁসাই গুপ্তধনের স্বপ্ন দেখছেন। ওসব বাজে কথা। সরলাবুড়ির বাড়ি আমরা অতিপতি করে খুঁজে দেখেছি। গুপ্তধন নেই।

আলবাৎ আছে। অন্তত দু ঘড়া মোহর।

১০ম পরিচ্ছেদ

সুজন বোস সকালবেলা থেকেই একটু চিন্তিত, তিন কাপ কালো কফি খেয়ে বাগানে পায়চারি করে চিন্তার জট ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন, তাতে মাথার মেঘ কাটেনি। এখন বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ নিজের ল্যাবরেটরিতে বসে একটা সায়েন্স ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছেন।

দক্ষিণের জানালার দিকটায় ফণিমনসার ঝোপজঙ্গল, সেদিক থেকেই মৃদু একটু গলা খাঁকারির আওয়াজ এল।

সুজন ভ্রুটা সামান্য কুঁচকে মৃদু গলায় বললেন, আসতে পারো। মিনিটখানেক বাদে ল্যাবরেটরির খোলা দরজায় পাগলু এসে বশংবদ মুখ করে দাঁড়াল।

কী খবর পাগলু ?

আজ্ঞে খবর তো মেলা, ধীরে ধীরে বলতে হবে। সময় লাগবে। সুজন একটু হেসে বললেন, গাঁয়ের লোকের একটা দোষ কী জানো? তাদের কাছে সময়ের কোনও দামই নেই। সময় কেমন করে কাটাবে তাই তারা ভেবে পায় না। এক মিনিটের কথা এক ঘণ্টা ধরে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বলে।

তা যা বলেছেন।

গুরুতর খবর হলে বলতে পারো, তবে সংক্ষেপে।

যে আজ্ঞে। আমার এক স্যাঙাত আছে, জগা। জানেন তো !

শুনেছি, চোর তো !

আজ্ঞে, তবে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। আজ তাকে দিনুগুণ্ডা ধরেছিল একটা খুনের কাজে লাগানোর জন্য। আর গোঁসাই গোপেশ্বর আমাদের পাকড়াও করেছিল নিতাই পালের খবরের জন্য।

ভ্রুটা একটু কোঁচকালো সুজনের। বললেন, নিতাই পালের কথা সে কী বলছে?

সে বলছে নিতাই পালই নাকি শূলপাণিকে গুম করেছে।

সুজন গম্ভীরভাবে শুধু বললেন, গুম। আর কিছু ?

মাথা নেড়ে পাগলু বলল, সংক্ষেপে বলতে বলছেন, তাই সংক্ষেপেই বললুম, তবে গোপেশ্বরের বিশ্বাস সরলাবুড়ির দু ঘড়া মোহর আছে।

সুজন একটু হাসলেন, বললেন, মোহরের গপ্পো আমিও শুনেছি। মোহর কি ছেলের হাতের মোয়া?

আজ্ঞে, আমরাও তাই বলেছি।

ঠিক আছে, এখন যাও। পরঞ্জয়বাবুর খবর-টবর একটু নিও।

আজ্ঞে নিয়েছি। কাল রাতেই গিয়েছিলাম। দিব্যি মনের আনন্দে আছেন। কোনও খবর দিতে হবে কি ?

খবর দেওয়ার কিছু নেই। শুধু জেনে আসবে কিছু লাগবে-টাগবে কি না, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না।

কিছু লাগবে না। মনের আনন্দে আছেন।

ঠিক আছে। এখন যাও !

পাগলু চলে যাওয়ার পর সুজন চুপ করে বসে রইলেন। মিনিট দশেক ধ্যানস্থ থাকার পর উঠে ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে খিল দিয়ে লোহার আলমারিটা খুললেন। ভেতর থেকে একটা কাঠের বাক্স বের করে ডালাটা খুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। বাক্সের ভেতর সাতটা কড়ি আর সাতটা পয়সা। রোজই কিছুক্ষণ তিনি জিনিসগুলো দেখেন। সাতটা কড়ি মানে সাতকড়ি নামের কেউ একজন— এটা বুঝবার জন্য বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। কিন্তু মুশকিল হল সাতটা পয়সা নিয়ে। পয়সার ধাঁধা তিনি এখনও সমাধান করতে পারেননি। সাতটা পয়সা মানে সাত পা হাঁটার সংকেত হতে পারে, সাত ফুট দূরত্ব হতে পারে, কিংবা আরও অনেক কিছু।

সুজন বাক্সটা আবার যথাস্থানে রেখে আলমারি বন্ধ করে চেয়ারে বসতে যাচ্ছেন এমন সময়ে বাইরে হেঁড়ে গলায় কে ডাকল, সুজনবাবু আছে নাক ?

সুজন দরজা খুলে দেখলেন, গদাই নস্কর আর নগেন দারোগা দাঁড়িয়ে আছেন।

সুজন মৃদু হেসে বললেন, আসুন আসুন।

ল্যাবরেটরির এক ধারে চেয়ার-টেয়ার পাতা আছে। দুজনে বসবার পর নগেন দারোগা বলল, এসে ডিস্টাব করলাম নাকি? কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছিলেন না তো !

সুজন হেসে বললেন, কথাটা ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরিতে কি গবেষণা হয়? যন্ত্রপাতি কোথায়? ইলেকট্রিক কোথায়? গবেষণা টবেষণা নয়, বসে বসে চিন্তা-ভাবনা করি আর কি, তা কী খবর বলুন?

নগেন দারোগা পা ছড়িয়ে বসে বললেন, এ গাঁয়ে আপনিই সবচেয়ে মান্যগণ্য লোক। অনেক লেখাপড়া করেছেন, বিলেত-বিদেশ ঘুরে এসেছেন। আপনার কাছে একটা কথা বলতে আসা |

বলুন।

হরিপুর বড় শান্তির জায়গা ছিল। কখনও কোনও গণ্ডগোল হয়নি, কিন্তু ইদানীং এসব কী হচ্ছে বলুন তো!

সুজন শান্ত গলায় বললেন, শূলপাণির নিরুদ্দেশ হওয়া নিয়ে ভাবছেন নাকি?

শুধু শূলপাণি কেন? আমাদের পরঞ্জয়দাদারওতো একই কথা। দু-দুটো লোক গাঁ থেকে উবে গেল মশাই, এ কি সোজা কথা ?

সুজন একটু চিন্তিতভাবে বললেন, ঘটনা দুটি নিয়ে আমিও ভাবছি। শূলপাণির সঙ্গে আমার সামান্য আলাপ ছিল। পরঞ্জয়বাবু অবশ্য একরকম বন্ধু মানুষ। কিন্তু এরা কোথায় যেতে পারেন তা আমিও ভেবে পাচ্ছি না।

গদাই নস্কর বলল, এ অঞ্চল আমার চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। একসময়ে সারা তল্লাট জুড়ে আমি ডাকাতি করে বেড়িয়েছি। সব জায়গাতেই আজও আমার পুরনো চরেরা আছে। কিন্তু তারাও কেউ কোনও হদিস দিতে পারেনি।

সুজন গম্ভীরভাবে বললেন, চিন্তার কথা। নগেন দারোগা বলল, আপনি বুড়ো মানুষ, একা থাকেন, চোর ডাকাত জানে যে আপনি বিদেশ থেকে মেলা টাকা পয়সা নিয়ে এসেছেন। তাই আপনাকে নিয়েও আমাদের ভাবনা হচ্ছে। আপনি দুর্জয় সাহসী না হলে এভাবে একা থাকতেন না। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আপনার নিরাপত্তার জন্য একটা পাহারা বসাব ।

সুজন চমকে উঠে বললেন, সর্বনাশ ! ও কাজও করতে যাবেন না।

কেন বলুন তো !

সুজন মাথা নেড়ে বললেন, আপনাদের ধারণা ভুল। টাকা-পয়সা আমার বিশেষ কিছু নেই। বিদেশে আমি অনেক রোজগার করেছিলুম বটে, কিন্তু দেশে ফিরে একটা ব্যবসা করতে গিয়ে আমার বেশিরভাগ টাকাপয়সাই নষ্ট হয়েছে। এখন যা সামান্য আছে তা দিয়ে কোনওরকমে চলে যায়। চিন্তা করবেন না, টাকা-পয়সা আমার ঘরে থাকে না, কালীপুরের ব্যাংকে রাখা আছে।

নগেন দারোগা মাথা নেড়ে বলল, কিন্তু চোর-ডাকাতরা তো আর তা জানে না, তার হানা দিতে পারে।

সুজন একটু চুপ করে থেকে বললেন, আপনি প্রাক্তন দারোগা বলেই বলছি, দোষ ধরবেন না, এ-তল্লাটের চোর-ডাকাতদের আমি চিনি, কিছু ভাবসাবও আছে। আমাকে নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন হবেন না। আপনাদের কি ধরণা হয়েছে যে, শূলপাণি আর পরঞ্জয়ের পর এবার আমার নিরুদ্দেশ হওয়ার পালা ?

নগেন দারোগা মাথা চুলকে বলে, বলা তো যায় না।

সুজন বললেন, গুম করলে অন্যকথা, কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় হঠাৎ এ বয়সে নিরুদ্দেশ হওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। আর গুম করার চেষ্টা কেউ করলেও কাজটা সহজ হবে না। সত্তরেও আমি বেশ তেজী লোক। বালিশের পাশে পিস্তল নিয়ে শুই। ঘাবড়াবেন না, পিস্তলের লাইসেন্স আছে।

গদাই লস্কর চিন্তিতভাবে বলল, তবু সাবধানের মার নেই। আপনার বাড়িতে আলাদা করে পাহারা না বসালেও সারা গাঁয়ে সারা রাত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সুজন বললেন, ভালই করেছেন। তবে আমার বিশ্বাস, এসব গুম-টুম নয়।

নগেন বলল, তাহলে কী?

সুজন একটু চিন্তিতভাবে বললেন, শূলপাণি একজন বাতিকগ্রস্ত মাথাপাগলা লোক। আমি বৈজ্ঞানিক বলে সে আমার কাছে নানা উদ্ভট প্রস্তাব নিয়ে আসত।

গুপ্তবিদ্যা আর অলৌকিকের ওপর খুব ঝোঁক ছিল। আমার মনে হয় সে সেরকমই কোনও বিদ্যা অর্জনের জন্য কোথাও গেছে। কিংবা...

নগেন ঝুঁকে বসে বলে, কিংবা?

সে কথা থাক। আর একটু বিচার-বিশ্লেষণ করে ভেবে তবে বলা যাবে।

গদাই বলল, আপনি কি শুনেছেন যে তার ঘরে একটা কাঠের বাক্সে সাতটা কড়ি আর সাতটা পয়সা ছিল?

হ্যাঁ, শুনেছি। জিনিসগুলো সে আমাকে দেখিয়েও গেছে।

কেন দেখিয়েছিল ?

মাথা নেড়ে সুজন বলল, তা জানি না, সে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল এগুলো দেখে আমি কিছু বুঝতে পারছি কি না।

আপনি কী বললেন ?

আমি কিছু বুঝতে পারিনি আর সেটাই বললাম।

আপনি কি জানেন যেদিন সে গুম হয় সেদিন আমাদের নাকের ডগা দিয়ে বাক্সটা লোপাট হয়ে যায় ?

তাও জানি।

ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে না?

হচ্ছে।

ওই কড়ি আর পয়সা কোনও সঙ্কেতও হতে পারে তো !

হতেই পারে। কিন্তু সেই সঙ্কেত ভেদ করার মতো বুদ্ধি আমার নেই। আপনাদের বলি, এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত ভাবছেন কেন? গাঁয়ের মানুষ সহজেই রহস্যের গন্ধ পায়। আমি বিজ্ঞানী বলেই বাস্তবভাবে ব্যাপারটা দেখার চেষ্টা করি। ওই পয়সা আর কড়ির ভেতরে কোথাও সংকেত বা রহস্য না থাকারই সম্ভাবনা বেশি। যে বাক্সটা চুরি করেছে সে গুপ্তধনের সম্ভাবনার কথা ভেবেই করেছে হয়তো। কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না।

গদাই বলল, রাত আটটার সময় শূলপাণি রোজ অট্টহাসি হাসত। এখন সেটাকেও অনেকে সংকেত বলে মনে করছে। আপনার কী মনে হয় ?

সুজন মৃদু হেসে বললেন, হাসিটা আমিও শুনেছি। কিছু মনে হয়নি। বাতিক ছাড়া কিছু নয়।

নগেন দারোগা হতাশার গলায় বলল, না, আপনি দেখছি সবই উড়িয়ে দিচ্ছেন।

সব উড়িয়ে দিচ্ছি না। আপনারা যা বললেন এসব নিয়েও ভাবব। গদাই নস্কর আর নগেন দারোগ উঠতে যাচ্ছিল, সুজন বললেন, একটা কথা, গোপেশ্বর গোস্বামীকে তো চেনেন নিশ্চয়ই।

নগেন বলল, চিনবো না ? সে তো গাঁয়েরই লোক?

লোকটা কেমন?

মিটমিটে বিছু টাইপের, তবে তার নামে তেমন বড় কোনও অভিযোগ নেই। কেন বলুন তো?

এমনিই, কৌতুহল, সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে।

কী বলে সে ?

সুজন একটু হেসে বললেন, কূটকচালি করতেই আসে। লোকটাকে সুবিধের ঠেকে না।

নগেন মাথা নেড়ে বলে, লোক সুবিধের নয় ও। তেমন কিছু হলে জানাবেন, ধমকে দেবো।

না, না, ধমকানোর কিছু নেই। দুজনে চলে যাওয়ার পর সুজন উঠলেন। স্নান-খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়লেন। তাঁর একখানা মোপেড আছে। মোপেডটা ঘর থেকে বের করে উঠোনে নামিয়ে স্টার্ট দিলেন। তারপর গাঁয়ের দক্ষিণ প্রান্তের দিকে গাড়িটা চালিয়ে দিলেন।

হরিপুর ছাড়িয়ে মাইল পাঁচেক আসার পর মোপেড থামিয়ে কাঁধের থলি থেকে একটা শক্তিশালী ক্ষুদে দূরবীন বের করে পেছনের দিকটা ভাল করে লক্ষ্য করলেন সুজন, না, কেউ আসছে না অনুসরণ করে। নিশ্চিন্ত হয়ে তিনি ফের গাড়ি ছাড়লেন ।

প্রায় কুড়ি মাইল তফাতে সাতগাঁ। গ্রামের উত্তর দিকে একখানা পাকা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে নামলেন সুজন। বারান্দায় উঠে দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে একটা বেঁটে লোক উঁকি দিল। .

আরে, আপনি ?

জরুরী কথা আছে।

আসুন, ভেতরে আসুন।

সুজন ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

১১তম পরিচ্ছেদ

সন্ধের মুখে আজও ঝোড়ো হাওয়া ছাড়ল এবং ঘন মেঘ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর নামল তেড়ে বৃষ্টি।

কবিরাজ রামহরি কিছু গাছ-গাছড়ার খোঁজে হরিপুরের দক্ষিণে গড়নাসিমপুরের জঙ্গলে গিয়েছিলেন। ফেরার সময়ে এই দুর্যোগ। সঙ্গে অবশ্য ছাতা ছিল, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ায় ছাতা উল্টে শিকগুলো ছয় ছত্রখান। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বরফের কুচির মতো বৃষ্টির ফোঁটা থেকে মাথা বাঁচাতে রামহরি দৌড়ে সামনে যে বাড়িটা পেলেন তার মধ্যেই ঢুকে পড়লেন।

ঢুকেই খেয়াল হল এটা সরলাবুড়ির বাড়ি। এ-বাড়ি থেকে শূলপাণি নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে তালাবন্ধ হয়ে পড়ে আছে। ভয়ে লোকে এবাড়ির ত্রিসীমানায় আসে না।

রামহরি দাওয়ায় উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু দাওয়াতেও বৃষ্টির প্রবল ছাঁট আসছে। হাতড়ে-হাতড়ে ঘরের দরজাটা দেখলেন। বেশ বড়সড় তালা লাগানো। সুতরাং ঘরে ঢুকে যে গা বাঁচাবেন সে উপায় নেই। চারদিকে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। ব্যাঙ ডাকছে পেছনের পুকুরে। গাছপালায় বাতাসের অতিপ্রাকৃত শব্দ হচ্ছে। যেন পেত্নীর শ্বাস।

রামহরি গাঁয়ের লোক, সহজে ভয় খান না। কিন্তু আজ যেন গা-টা একটু ছমছম করছে। সরলাবুড়ির বাড়িটা গাঁয়ের বাইরে। কাছেপিঠে অন্য বাড়িঘড় নেই। সরলা পিসির সাহস ছিল বটে। একা এই নির্জন পুরীতে বুড়ি দীর্ঘদিন বাস করেছে। শূলপাণি তো এল এই সেদিন। .

কবিরাজি চিকিৎসায় খুব বিশ্বাস ছিল পিসির। শেষ কয়েক বছর রামহরিই তার চিকিৎসা করেছেন। বাড়িটার দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আজ অনেক কথা মনে পড়ছিল রামহরির। বিশেষ করে এক সন্ধেবেলার কথা। খুব শীত পড়েছিল সেদিন। গড়নাসিমপুরের জঙ্গলে সেইদিনই সন্ধেবেলা বাঘের ডাক শোনা যাচ্ছিল। খুব কুয়াশা ছিল চারদিকে। এটা যে সময়ের কথা তখন শূলপাণি আসেনি।

রামহরি যখন বুড়ির নাড়ী দেখছিল মন দিয়ে তখন বুড়ি হঠাৎ বলল, “ও বাবা রামহরি, তোকে একটা কথা বলব?”

“বলুন পিসিমা।”

আগে এ-গাঁয়ে মেলা চোর-ছ্যাঁচড় ছিল। বাইরে থেকেও আসত সব দেহাতি চোর। এ-বাড়িতে মাঝরাতেই আনাগোনা করত তারা। তখন ঘরের দোর এঁটে বসে খুব বকাঝকা করতুম তাদের। তা তারাও মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে বাইরে থেকে ঝগড়া করত। দু-চারটে চোরের সঙ্গে এ-ভাবেই বেশ ভাব সাব হয়ে গিয়েছিল।

রামহরি অবাক হয়ে বললেন, “তাই নাকি? এতো সাঙ্ঘাতিক কথা পিসি !”

একগাল হেসে বুড়ি বলল, “তা কী করি বল। আমার তিনকুলে কেউ নেই, গাঁয়ের লোকও কেউ বড় একটা আসে না। একা থাকি। তা চোরছ্যাঁচড়দের সঙ্গেই যা একটু কথাটথা বলতুম। এখন তারা আর আসে না। কেন বলতে পারিস?”

“তা তো জানি না পিসি। চোর-ছ্যাঁচড়দের সঙ্গে আপনারই বা দরকারটা কী।”

“ওই যে বললুম তোকে, তারা এলে দুটো কথা কয়ে বাঁচতুম। দু চারজনের সঙ্গে তো বেশ ভাবই হয়ে গিয়েছিল। কালীচোর ছিল, সাতগাঁয়ে বাড়ি। চার ছেলে, দুই মেয়ে নিয়ে বড় সংসার। তার আবার হাতে বাতব্যাধি ছিল। বউটী দজ্জাল বলে কত দুঃখ করত। আর ছিল নবা চোর। একেবারে ছেলেমানুষ। তার সৎ-মা বলে বাড়িতে আদর ছিল না। একবার তাকে জানালা গলিয়ে এক বাটি পান্ত ভাত খাইয়েছিলুম। আরও ছিল গণশ চোর। খুব পাজি ছিল। জানালায় দমাদম ইট মারত। একখানা টাকা ছিল তার বরাদ্দ। টাকা দিলেই চলে যেত।”

রামহরি হাসলেন, “উরেববাস ! এ তো সাঙ্ঘাতিক কথা।”

“তা বাবা, চোরসকল যে উধাও হয়ে গেল। এরকমটা কি ভাল ?”

“লোকে তো বলে চোর-ছ্যাঁচড় না থাকাই ভাল।”

“সে তোদের বেলায়। আমার বাপু, চোরটোর তেমন খারাপ লাগে না।”

রামহরি মাথা চুলকে বললেন, “একা থেকে থেকে আপনার মাথাটাই গেছে দেখছি পিসি। তা একা থাকবার দরকারটাই বা কী ? একজন কাজের মেয়ে রেখে দিন না, সে দিনরাত থাকবে আর মনের আনন্দে তার সঙ্গে বকবক করবেন।”

ওরে বাবা, কাজের মেয়ে রাখব কী রে ? তারা যে ভীষণ চোর হয়। আমি বুড়োমানুষ, কোথা থেকে কোন জিনিসটা সরাবে টেরও পাব না।”

রামহরি হেসে ফেললেন, “তা সরালে সরাক না। আপনি তো চোরই খুঁজছেন ?”

“না, না বাবা, ঘরে চোর পুষতে পারব না। তবে আমার এখন একজন চোর খুব দরকার। একটা ভাল দেখে চোর খুঁজে পেতে দিবি বাবা? আনাড়ি হলে চলবে না। বেশ পাকা চোর চাই। পারবি?”

রামহরির তো একগাল মাছি। সরলা পিসির মাথাটা যে একটু বিগড়েছে যে বিষয়ে তাঁর আর সন্দেহ রইল না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে মাথা বিগড়োনোর অন্যান্য লক্ষণ ঠিকমতো মিলছে না। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, “আচ্ছা দেখবখন। আমার কাছে রুগি যারা আসে তাদের মধ্যে খুঁজলে হয়তো একআধজন চোর পাওয়া যেতেও পারে ”।

"ওরে না না, ব্যাপারটা হালকাভাবে নিসনি। শক্ত কাজ, পাকা হাতের চোর ছাড়া পেরে উঠবে না।"

রামহরি অবাকের ওপর আরও অবাক হয়ে বললেন, চোরকে দিয়ে কী কাজ করবেন পিসি?"

"তোর মাথায় কি গোবর রে রামহরি ? চোর চাইছি কি চণ্ডীপাঠ করবে বলে?"

"তাহলে ?"

"চোরকে দিয়ে চুরিই করাব বাবা। তবে কাজটা শক্ত। তাই পাকা হাতের লোক খুঁজছি।"

"চুরি করাবেন পিসি ? কী সব্বোনেশে কথা! কী চুরি করাবেন ? কেন চুরি করাবেন ? চুরি করা যে মহা পাপ।"

ফোকলা মুখে এক গাল হেসে সরলা পিসি বলল, "শাস্তরের কথা কি আর জানি না রে বাপ! সব জানি, চুরি করা পাপ, মিথ্যে কথা বলা পাপ, আরও কত পাপ আছে।"

"তাহলে চুরি করতে চাইছেন কেন ?"

"কথাটা ভেঙে বলতে পারছি না রে বাপ। বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কথাটা এখুনি ফাঁস হয়ে গেলে মুশকিল। আগে একটা ভাল দেখে চোর এনে দে, কাজটা উদ্ধার হোক, তারপর একদিন তোকে সব খুলে বলব।"

রামহরির যদিও সরলা পিসির মাথার গণ্ডগোল হয়েছে বলে সন্দেহ রয়ে গেল, তবু চোরও তিনি কিন্তু খুঁজেছিলেন। তাঁর রুগিদের মধ্যে একজন ছিল নিতাই পাল। তার আধকপালে মাথা ধরার জন্য চিকিৎসা করাতে আসত। নিতাই নানা জায়গায় ঘোরে, খুব ফিকিরফন্দি জানে। তা তাকেই রামহরি চোরের কথা বললেন, "ও নিতাই, আমাকে ভাল একজন চোরের সন্ধান দিতে পারো?"

"চোর !" বলে নিতাইয়ের যে কী হাসি, হাসি আর থামেই না, তারপর বলল, "কবরেজমশাই, ব্যাপারটা কী?"

"সে আছে, বলা যাবে না।"

"বলি চোর ধরে তাকে বেটে বা থেতো করে ওষুধ বানাবেন না তো ! আয়ুর্বেদে নাকি কিম্ভূত আর বিটকেল নানা জিনিস দিয়ে ওষুধ বানায়।"

"আর না না অন্য ব্যাপার "

তা নিতাই এনেছিল দুটো চোরকে, একজন ফিচকে, অন্যজন ফটিক, দুজনেরই বয়স কম, দুজনেই রোগা, দুজনেই কালো, দুজনেরই মাথায় বাবরি চুল, দুজনের চোখেই বেশ চালাক-চালাক দৃষ্টি আর দুজনেরই মুখে মিচকে হাসি, রামহরি বুঝলেন, এরা সত্যিই কাজের লোক।

দুজনকেই সরলা পিসির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন রামহরি, চোর দেখে পিসির আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি মুড়ির মোয়া আর নাড়ু খেতে দিলেন। তারপর রামহরিকে বললেন, “তোর উপকারের কথা ভুলব না। এবার তুই বাড়ি যা এদের সঙ্গে আমার গোপন শলাপরামর্শ আছে।”

এতদিন বাদে সেইসব কথা মনে পড়ে রামহরির একটু হাসি পাচ্ছিল, চোর দিয়ে সরলা পিসি কী করেছিল তা আজও জানে না রামহরি।

সামনেই একটা তালগাছের মাথায় নীল একটা বিদ্যুতের ধাঁধানো শিখা নেমে এল। দপ করে আগুন জ্বলে উঠল গাছের মাথায়। তারপর যে বাজের শব্দটা হল তা থেকে কান বাঁচাতে রামহরি দুকান চেপে ধরে রইলেন।

তারপরই হঠাৎ শুনতে পেলেন খুব কাছে কারা যেন কথা কইছে, একটু থতমত খেয়ে ঠাহর করে শুনলেন, তালাবন্ধ ঘরের ভেতর থেকে কথা শোনা যাচ্ছে। রামহরির মেরুদণ্ড বেয়ে হিমের স্রোত নেমে গেল।

১২তম পরিচ্ছেদ

রামহরি আসলে সাহসী মানুষ, বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে কথার আওয়াজ পেয়ে প্রথমটায় ভয় খেলেও সামলে গেলেন। তারপর জানালার বন্ধ পাল্লায় গিয়ে কান পাতলেন, ঝড়-বৃষ্টির শব্দে প্রথমটায় কিছু শুনতে পেলেন না। কিন্তু প্রাণপণ মনঃসংযোগ করে থাকার ফলে একটু বাদে শুনতে পেলেন, কে যেন কাকে বলছে, “হাঁ হাঁ বাবু ও বাত তো ঠিক আছে, কসুর হই গিছে বাবু। হামি সমঝলাম কি বহোত দিন বাদে ইস তরফ যখন এসেই গেছি তখন বুড়ি মায়ের সঙ্গে একটু বাতচিত করিয়ে যাই। উসি লিয়ে—”

অন্য গলাটা বাঘা গর্জন করে উঠল, “চোপ বেয়াদব, ফের মিছে কথা হচ্ছে! বুড়িমাকে তুই চিনতিস ? তুই তো ঢুকেছিলি চুরি করতে! ”

অন্য গলাটিতে বিনয় ঝরে পড়ল, “নেই মালিক চোরি ওরি হামার কাম নেই। হামি তো মুলকমে চাষবাস করে খাই।”

“চোর যদি না হোস তবে ওই সিদটা কেটেছে কে ?”

কই চোর টোরের কাম হোবে হুজৌর। শিয়াল ভি হোতে পারে। হামি উসব কাজ জানি না মালিক ”।

“না তুমি ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না তা বুঝেছি। কিন্তু তোর হাতে যে মাটির দাগ লেগে আছে, পায়ের কাছে যে সিঁদকাটি পড়ে আছে এগুলো কোথেকে এল?”

“উরে বাপ ! এটা কি সিঁদকাটুয়া আছে নাকি বাবু ? এইরকম চিজ তো হামি কখুন দেখি নাই! হুজুর মালুম হয়েছে কি কোনই চোর চোট্টা-বদমাশ জরুর ঘুসিয়ে কোথা ছিপকে বৈসে আছে। ঢুঁড়লে উসকো মিলে যাবে।”

“হ্যাঁ, তুমি বড় সাধুপুরুষ। এখন বল তোকে যদি মেরে পুঁতে ফেলি তাহলে কেমন হয়?”

“খুব খারাপ হোবে মালিক, হামি ভালা আদমি আছে।”

“তুই ওই সিঁদ দিয়ে ঢুকেছিস। নইলে তোর গায়ে অত কাদামাটি লেগে আছে কেন?”

“ওই বাত ঠিক আছে মালিক। বহোত দিন বাদ ইদিকে আসলাম তো ভাবলাম কি বুড়িমার সঙ্গে একটু মুলাকাত করে যাই। দরওয়াজা বন্ধ দেখে বুড়ি মা বুড়ি-মা বোলকে চিল্লমিল্লি কোরে দেখলাম কোই আওয়াজ নেই। তখুন কোঠিকে পিছে এসে দেখলাম ই গোর্তটা আছে। তখুন ভাবলাম কি বুড়িমার জরুর কোই তকলিফ হোচ্ছে। উস লিয়ে গোর্তোর ভেতর দিয়ে ঢুকে আসলাম। ”

মোটা গলার লোকটা হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হেসে বলল, “বটে ! তোর মনটা দেখছি ভারি নরম। এখন বল তো, বুড়িমাকে তুই চিনতিস ?”

“হাঁ হাঁ, জরুর। বুড়ি মা বহুৎ ভাল আদমি ছিলেন।”

“তোর সঙ্গে কী করে আলাপ হল ?”

“হামি বুড়িমার কাজ-কাম কুছ কোরে দিতাম। লাকড়ি কেটে দিতাম, পানি তুলে দিতাম, বাতচিত ভি হোতো।”

“কী বাতচিত হত ?”

“কোই খাস বাত নেই, বুড়ি মা পুছ করতেন, বেটা রামপ্রসাদ, তোহার মতো আইসা আচ্ছা লেড়কার ইতনা মুসিববত কাছে? আশমানে ভগবান যদি থাকেন তো তেরা ভি একদিন ডাল গলেগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কুছু হোবে তোর রামপ্রসাদ । এই বুড়িমার আশীর্বাদ তোহার ভালা হি কোরবে ।”

“বটে ! বুড়ি মা তোকে আশীর্বাদ করত। আর তার জন্যই তুই বুড়িমার ঘরে সিদ কাটলি ?”

“ছিঃ ছিঃ হুজুর, সিঁদ তো আর কোই কাটিয়েছে, হামি তো শুধু ঘুসেছি।”

“কেন ঘুসেছিস সত্যি করে বল। নইলে এই যে ভোজালি দেখছিস এটা তোর পেটে ঢুকে যাবে।”

“রাম রাম বাবুজি, উসব ভোজালি-উজালি খুব খারাপ জিনিস আছে। রামপ্রসাদ ছোটমোটা আদমি আছে, ছুছুন্দর মারিয়ে হাতমে গোন্ধো কাহে করবেন?”

হাত গন্ধ করতে আমার আপত্তি নেই। এখন খোলসা করে বল তো, কী খুঁজতে এখানে ঢুকেছিলি?”

“হনুমানজিকি কিরিয়া হুজুর, মতলব কুছু খারাপ ছিল না। বুড়িমার আশীর্বাদ লিব বলে একবার এসেছি। কাম কাজ কুছু খারাপ যাচ্ছে।”

“চোপ ব্যাটা ! ফের মিথ্যে কথা !”

পটাং করে একটা থাপ্পড়ের শব্দ শুনে বাইরে রামহরি চমকে উঠলেন, থাপ্পড়টার যেন বাজের মতোই আওয়াজ হল।

“মর গয়া বাপ রে! ”

“এবার বল ব্যাটা। নইলে—”

“আচ্ছা, আচ্ছা, বলছি মালিক, ইতনা জোর বাপটা নেই খায় হুজুর ”

“এবার বলবি? না ফের একটা বসাতে হবে?”

“নেহি হুজুর, আউর নেহি, আমি ঘুসেছিলাম একটা জিনিস একটু ঢুঁড়তে ”

“কী জিনিস ?”

“কোই খাস জিনিস না আছে বাবুজি। একটা বাক্স।”

“বাক্স ! তাতে কী আছে ?”

“সে হামি জানি না। তবে বাক্সটা বুড়ি মা চোরাই করিয়ে লিয়ে এসেছিলেন।”

“চুরি করে? কে বলল তোকে?”

“যৌন চুরি করিয়েছিল উসি আদমি বোলা মালিক ”

“সে কে?”

“নাম বললে আপনি চিনবেন?”

“বলেই দ্যাখ না।”

“একটার নাম ছিল ফটিক আর দুসরার নাম ছিল ফিচকে।

“ফটিক আর ফিচকে? কই এরকম নামে তো কাউকে চিনি না।”

দেখে চিনবেন মালিক, দোনো চোর ছিল।”

মিছে কথা বলছিস না তো ?”

“সীতা মিয়িকি কিরিয়া, মালিক, ঝুট কিঁউ বোলবে?"

“বাক্সে কী ছিল?”

“কিসকো মালুম ? কোই খাস চিজ হোতে পারে। ওই দেখনেকে নিয়ে এসেছিলাম তো এসে দেখি আপনি ঘোরের মধ্যে বসিয়ে আছেন। রাম রাম

বাবুজি, হামি তাহলে এখুন আসি ?”

ফের সেই হাঃ হাঃ অট্টহাসি। তারপর গর্জন আমাকে “বোকা ঠাওয়ালি নাকি রে রামপ্রসাদ? এত সহজে ছাড়া পাবি ভেবেছিস? আগে কথা ওগরা, ওই বাক্সে কী ছিল বল, নইলে-”

“হাঁ হাঁ পরেসান কেন হোবেন হুজুর? ফিন ঝাপটা মারলে হামি তো মরিয়ে যাবে।”

“তাহলে ভালয় ভালয় বলে ফ্যাল

“হুজুর কসুর মাফ করিয়ে দিবেন, ফটিক হামাকে বলেছিল কি বাক্সের মধ্যে কুছ তামাক পয়সা আর কড়ি ছিল। কুছ খাস চিজ নেহি। বুড়ি মা উন দো চোরকো দেশে রুপিয়া বকশিশ দিয়েছিল। স্রিফ কড়ি আর পয়সাকা লিয়ে বুড়ি মা কেন দো শো রুপেয়া বকশিশ দিয়েছিল ওহি পুছনেকে লিয়ে হামি এসেছিলাম।”

“সেটা তো আমারও জানা দরকার। সাতটা পয়সা আর সাতটা কড়ির জন্য সরলা পিসি এত উতলা হয়েছিল কেন। তুই কিছু জানিস না ?”

“নাহি মালিক, রামপ্রসাদ বুরবাক আদমি আছে।”

“কেমন বুরবাক তা বুঝতেই পারছি। তা বাক্সটা সরাল কে তা জানিস ?”

“নেহি মালিক, হামি তো মুলুকে চালিয়ে গিয়েছিলাম।”

“কত দিন আগে?”

“চার-পাঁচ বরস হোবে, গুস্তাকি মাফ করবেন বাবুজি, বাক্সটা কুথায়?”

“কোথায় তা জানলে কি আর বসে আছিরে ব্যাটা? তন্নতন্ন করে খুঁজে কোথাও পাইনি। যে সরিয়েছে তাকে হাতের কাছে পেলে ধড় আর মুণ্ডু আলাদা করতাম।”

“হজুর একটা বাত বলব?"

“বল ”

“রাত হোয়ে আসছে। আধিয়ারি মে হামি কুছু ভাল দেখতে পাই না। আমাকে আভি ছোড়িয়ে দিন। বরখা ভি হোচ্ছে। ভুখ ভি লাগা হ্যায়।”

“বটে! পালাতে চাস ? দাঁড়া, আমার একটা স্যাঙাৎ এখনই এসে পড়বে। সে এলে তোর বিচার হবে। তারপর ভেবে দেখব তোকে ছাড়া যায় কি না।”

১৩তম পরিচ্ছেদ

রামহরি একটু ভূ কুঁচকে ভাবলেন, সরলা পিসির বন্ধ ঘরে যে নাটকটা হচ্ছে তার কুশীলবকে একটু স্বচক্ষে না দেখলে তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন না। কিন্তু কুট করে ঢুকবার পথ নেই। আর ঢুকলেও যে বিপদ হবে না তাকে বলতে পারে? ঠিক এই সময়ে রামহরির হঠাৎ মনে হল, তার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, একবার ঘাড় ঘোরালেন রামহরি, কিন্তু ঘুটঘুটি অন্ধকারে কিছু ঠাহর হল না। বৃষ্টির তোড় আর বাতাসের জোর দুই-ই বাড়ছে। রামহরি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, দু-একবার বিদ্যুৎ চমকাল বটে, কিন্তু সে আলোতে কাউকে দেখা গেল না।

রামহরি ভাবলেন, মনের ভুলই হবে। এই দুর্যোগে কে এসে তাঁর পেছনে লাগবে? তবে এখানে আর কালক্ষেপ করা যে যুক্তিযুক্ত হবে না সেটা বুঝতে পারলেন রামহরি। সুতরাং ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করেই তিনি দাওয়া থেকে নেমে পড়লেন, তারপর বয়স অনুপাতে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যত জোরে ছোটা যায় তত জোরেই ছুটতে লাগলেন। কিন্তু সম্মুখে এত ঘুটঘুটি অন্ধকার যে, দৌড় কেন হাঁটাও খুব কঠিন, রামহরি প্রথমে একটা বাগানের বেড়া ভেঙে কুড়মুড় করে পড়লেন, তাতে "চোর, চোর" বলে কেউ চেঁচিয়ে ওঠায় ভয় খেয়ে রামহরি আর এক দফা ছুটতে গিয়ে একটা গাছের সঙ্গে বেজায় ধাক্কা খেয়ে ধরণীতলে জলকাদায় প্রপাত হলেন, এবং ফের উঠে দিগভ্রান্ত হয়ে কোথায় যে যাচ্ছেন তা বুঝতে না পেরে হাঁটিতে লাগলেন।

একবার তাঁর মনে হল পথ ভুলে গাঁয়ে ঢোকার বদলে গাঁয়ের বাইরেই চলে এলেন নাকি? এখন চেপে বৃষ্টি হচ্ছে, বিদ্যুতের চমকানি নেই বলে রাস্তাঘাট কিন্তু ঠাহর করার উপায় দেখছেন না। এ অবস্থায় হাঁটা অতীব বিপজ্জনক। কোন খানাখন্দ পুকুরে-ডোবায় পড়েন তার ঠিক কী?

রামহরি সুতরাং একটা গাছ ঠাহর করে তার নিচে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ছোটোছুটিতে যথেষ্ট ধকলও গেছে। একটু জিরোনোও দরকার। সরলাপিসির বাড়িতে কারা ঢুকে বসে আছে সে কথাটাও মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সাতটা কড়ি আর সাতটা পয়সার কথাও ভুলতে পারছেন না।

ঝড়বৃষ্টি এবং ঘুটঘুটি অন্ধকারের ভেতরে হঠাৎ রামহরি একটা ক্ষীণ আলোর রেশ দেখতে পেলেন। সামনে, পঞ্চাশ-ষাট গজ দুরে যেন একটা লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে। মনে হল, কোনও বাড়ি থেকেই আলোটা আসছে, যার বাড়ি হোক আশ্রয় তো আপাতত জুটবে, গায়ের সব লোকই তো চেনা।"

রামহরি গুটি-গুটি আলোটার দিকে এগোতে লাগলেন, যত এগোচ্ছেন আলোটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, গাছপালার মধ্যে বাড়ির মতো কিছু একটার আকার দেখা যাচ্ছে। রামহরি 'জয়দুর্গা' বলে এগিয়ে একেবারে বাড়ির দাওয়ায় উঠে পড়লেন, পাকা দালান, সামনেই একটা ঘরের কাচের শার্শি দিয়ে লণ্ঠনের জোরালো বাতি দেখা যাচ্ছে। চিনতে আর ভুল হল না রামহরির, কাঁচের শর্শিওলা বাড়ি হরিপুরে একটাই আছে। এ হল সুজন বোসের বাড়ি।

সুজন বোসের বাড়িতে সর্বদা গরম কফি পাওয়া যায়। মানুষটি পণ্ডিতও বটে, কথা কয়ে যেন আরাম, গা পুছে একটু জিরিয়ে বৃষ্টির তোড়টা কমলে বাড়ি যাওয়া যাবে।

ও সুজনবাবু—”

কেউ সাড়া দিল না। রামহরি আরও বারকয়েক হাঁকডাক করলেন, আশ্চর্যের ব্যাপার! ভেতরে আলো জ্বলছে। তালাও দরজায় দেওয়া নেই, তবে লোকটা কি বাথরুম-টাথরুমে গোছে? রামহরি জানালা দিয়ে ভেতরে উকি দিলেন, জানালায় একটা হাফ পরদা টানা থাকায় কিছুই দেখতে পেলেন না প্রথমে। কিন্তু পরদার ডানদিকে নিচের কোনাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে দেখে সেখানে চোখ পেতে রামহরি আপনমনেই বলে উঠলেন, সর্বনাশ! যা দেখলেন তা হল পায়জামা-পরা দুখানা পা মোঝতে সটান হয়ে আছে। এক পায়ে চটি, অন্য পা খালি, এর মানে সুজন হয় অসুস্থ হয়ে পড়ে গেছে, যেমনটা ষ্ট্রোক হলে হয় নইলে অন্য কিছু...

রামহরি আতঙ্কিত হলেও তিনি কবিরাজ মানুষ, লোকের রোগ ভোগ, বিপদ দেখলে পালানো তাঁর ধর্মনয়, তিনি দরজায় ফের ধাক্কা দিলেন, তারপর ওপর দিকটা হাতড়ে দেখলেন, বাইরে থেকে শেকল তোলা আছে। শেকলটা খুলতেই বাতাসের ধাক্কায় দরজার দুটো পাল্লা ধড়াস করে খুলে গেল।

ঘুরে ঢুকেই আগে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি দিলেন রামহরি। তারপর দেখলেন ঘরটার অবস্থা লণ্ডভণ্ড। স্টিলের আলমারিটা হা করে খোলা। সুজন মেঝেতে সটান হয়ে শুয়ে আছেন উপুড় হয়ে।

হাঁটু গেড়ে বসে আগে নাড়ীটা পরীক্ষা করলেন রামহরি, নাড়ী আছে, প্রাণে বেঁচে আছে লোকটা। ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে রামহরি সুজনের মাথার পেছনে ক্ষতস্থানটা আবিষ্কার করলেন। লাঠি বা ওরকম কিছু নয়, নরম ভারী জিনিস দিয়ে সুজনকে মারা হয়েছে মাথায়। তার ফলে জায়গাটা ফুলে কালশিটের মতো পড়লেও রক্তক্ষরণ তেমন হয়নি, রবারের হোস দিয়ে মারলে এরকম হতে পারে।

মুখে-চোখে একটু জল ছিটিয়ে দিলেন রামহরি, তারপর হাত-পা ভাঁজ করে কিছু প্রক্রিয়া চেষ্টা করলেন, মিনিট দশেকের চেষ্টায় সুজন চোখ মেলে চাইলেন, খুব ভ্যাবলা চোখ। যেন কিছুই চিনতে পারছেন না।

আরও মিনিটদশেক বাদে সুজন উঠে চেয়ারে বসতে পরলেন, মুখে কথাও ফুটল।

“ওঃ, মাথাটা ছিড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়।”

“কে মারল আপনাকে?”

সুজন মাথা নেড়ে বললেন, “জানি না, মুখ ঢাকা দুটো লোক।”

“কখন হল ?”

“সন্ধের পর। ঘরে বসে কাজ করছিলাম, কে যেন দরজায় কড়া নাড়ল, উঠে দরজা খুলতেই দুই মূর্তি ধাক্কা দিয়ে ঢুকে পড়ল!”

“পিস্তল বার করার চেষ্টা করেছিলাম, পারলাম না, তার আগেই পেছন থেকে মাথায় এমন মারল, তারপর আর কিছু মনে নেই।”

“আপনার ঘরে ঢুকে ওরা তো লুটপাট করে নিয়ে গেছে বলেই মনে হবেই, নাঃ, এ-গাঁ ক্রমে বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠছে দেখছি।”

সুজন মাথাটা দুহাতে চেপে বসে ছিলেন, হঠাৎ মুখ তুলে আলমারিটার দিকে চেয়ে বললেন,“সর্বনাশ!”

বলেই তাড়াতাড়ি উঠে এসে আলমারিটার ভেতরে কী যেন আঁতিপাতি করে খুঁজে দেখলেন, তারপর বললেন, “নাঃ, নিয়েই গেছে!”

“কী নিয়ে গেছে সুজনবাবু ?”

“ওঃ সে একটা সোনার গয়না।”

“কীরকম গয়না ?”

“ঠিক গয়না নয়। একটা সোনার ঘড়ি । দামি জিনিস।”

কথাটা যেন একটু কেমন ভাবে বলা। রামহরি একটু সন্দিহান হলেন, কিন্তু কিছু বললেন না।

সুজন বললেন, আমার ঘরে দামি জিনিস বা টাকা-পয়সা তেমন কিছু থাকে না। সবই যেত।”

রামহরি চিন্তিতভাবে বললেন, “সোনার ঘড়িটাই বা কম কিসের? কত ভরি সোনা ছিল ওতে?”

“দু-তিন ভরি হবে বোধ হয় ওজন করিনি।"

“কী ঘড়ি ?”

“রোলেক্স ”

“টেবিলের ওপর এই যে ঘড়িটা দেখছি এটাও তো রোলেক্স বলেই মনে হচ্ছে। এটা নয় তো!”

সুজন যেন একটু তটস্থ হয়ে বললেন, “না ওটা তো আমি হাতে পরি। এটা ছিল তোলা ঘড়ি।”

“ওষুধপত্র ঘরে কিছু আছে? ক্ষতস্থানে একটু বরফ দিলে হত।"

“বরফ কোথায় পাব? তবে আমার কাছে কিছু ওষুধ থাকে। চিন্তা করবেন না, সামলে নেব, আপনি এসে না পড়লে কী যে হত।”

রামহরি বললেন, “আমি না এলেও তেমন কিছু হত না। একটু বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়ে থাকতে হত আর কি ”।

সুজন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “আমার একটা কথা রাখবেন রামহরি বাবু?”

“বলুন।”

“এ ঘটনাটার কথা কাউকে জানাবেন না।”

“কেন বলুন তো? এত বড় ঘটনা চেপে যাবো ?”

চাপতে হবে না। দুদিন সময় চাইছি। আমি নিজে একটু তদন্ত করতে চাই। তারপর বলবেন।

১৪তম পরিচ্ছেদ

ঝড়-জলের রাত বলে তো আর ঘরে শুয়ে নাক ডাকলে জগার চলবে না। জগা তাই নিশুত রাতে শহিদলালের দক্ষিণের ঘরের একখানা কমজোরি জানালার পুরো কাঠামটাই খুলে ফেলল, ঝড়-জলের রাত বলে দুটো সুবিধে, আজ রাত-পাহারার লোকেরা কেউ বোরোয়নি, আর দুনম্বর সুবিধে হল, একটু-আধটু শব্দ হলেও কেউ শুনতে পাবে না।

বৃষ্টিটা বেশ চেপেই পড়ছে হাওয়াটাও বেশ তেজালোই, শহিদলালের জামাই এসেছে শহর থেকে। বেশ ফাঁপালো জামাই, তামাক বেচে কাঁচা পয়সা। পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম এঁটে কাল বিকেলেও টহল দিচ্ছিল, চার আঙুলে আংটি, বুকপকেটে সর্বদা দু-পাঁচটা একশো টাকার নোট।

জগা বাঁশবনের দিকটা একটু চেয়ে দেখল। কাজ সেরে এই পথেই সটকে পড়া যাবে।

অন্ধকার ঘরে ঢোকা নানা কারণেই একটু ভয়ের। তাই জগা উঁকি মেরে দেখে নিল ভেতরটা, চোখ তার খুবই ভাল, অন্ধকারেও দেখতে পেল, সুটকেসখানা একটা টেবিলের ওপর রাখা, পাঞ্জাবিটা আলনায় ঝুলছে। জিনিসগুলো যেন তাকে দেখতে পেয়ে আহ্লাদে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, এসো এসো জগাভায়া, তোমার জন্যে হ্যা-পিত্যেস করে বসে আছি।

জগা জানালায় উঠে ভেতরে লাফ দিয়ে নামল, কাজটা বেশ জলের মতো সোজা বলেই মনে হচ্ছে। মেয়ে-জামাই অঘোর ঘুমে, চারদিক শুনসান, তবে জগা বেশি লোভ করবে না, অতি লোভে তাঁতি নষ্ট। জামাইয়ের সুটকেসখানা,

সোনার বোতাম সমেত পাঞ্জাবি আর কাসার বাসান-টাসন যদি কিছু থাকে। কাজটা বড্ড সোজা দেখে জগার একটু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাবও এল। তাই সে তাড়াহুড়ো না করে একটু জিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল টেবিলের দিকে।

ঠিক এই সময়ে কে যেন খুব চাপা স্বরে বলল, উহু। জগা চমকাল এবং থমকাল, কে কথা কয়? জামাই নাকি? দাঁড়ানো লোককে সহজেই দেখা যায়, জগা তাই টক করে উবু হয়ে বসে পড়ল। আর বসতেই লোকটার একেবারে মুখোমুখি। টেবিলের নিচে ঘাপটি পেরে জাম্বুবানের মতো বসে আছে, আর জ্বলজ্বল করে তাকে দেখছে।

জগা ভয় খেয়ে বলল, জামাই বাবাজি নাকি ? ইয়ে-তা-একটু দেখা করতে এলুম আর কি? শত হলেও আপনি গায়ের কুটুম, দেখা না করাটা ভারি অভদ্রতা হয়ে যাচ্ছিল।

লোকটা চাপা গলায় বলল, কোন জামাই? হামি তো রামপ্রসাদ আছে। জগা টক করে বুঝতে পারল, লোকটা জামাই নয়। তবে কি পুলিশ টুলিশ? একটু মাথা চুলকে সে বলল, তা সেপাইজি, কেমন আছেন? শরীর গতিক সব ভাল? বাড়িতে বালবাচ্চা সব ভাল তো!

কোন সিপাহী হ্যায় রে বুরবক? ঐ ঘরে হামি আগে ঘুসিয়েছি, মাল উল সব আমি লিব। তু আভি ভাগ।

জগা এবার জলের মতো পরিষ্কার বুঝতে পারল এ লোকটা জামাইও নয়, সেপাইও নয়। এ লোকটা আর এক চোর, আগেভাগে ঢুকে বসে আছে। বুঝতে পেরেই জগার রাগ হল, বলল, তার মানে? তুমি যেমন রামপ্রসাদ, আমিও তেমনি জগা। তুম ভি মিলিটারি হাম ভি মিলিটারি। ভাগেকা কাহে? মাল উল সরাতে আমিও জানি।

হাঁ হ্যাঁ উ বাত তো ঠিক আছে রে জগুয়া লেকিন কুছ কানুন ভি তো আছে রে। এক ঘর মে দো চোর কভি ঘুষতা হ্যায়? আশমানমে কি দোঠো চাঁদ হোয় রে পাগল, যৌন আগে ঘুসিয়েছে সেই সব লিবে।

জগার মাথাটা একটু গরম হয়েছিল, এবার আরও এক ডিগ্রি চড়ল। সে বলল, এঃ, আমাকে আইন শেখাতে এলেন। আইন আমিও কিন্তু কম জানি না। আমি এ গাঁয়ের চোর, আমার হক অনেক বেশি। তুমি তো বাইরের চোর গায়ে ঢুকে অন্যায় করেছ।

তুকে কে বলল হামি বাহারের লোক আছি? তুহার উমর কতো রে বদমাশ? হামি বহৎ আগে ই গেরামে কত কাম কাজ করিয়েছি সো জানিস? জগাইবাবু নগেনবাবু জমিদারবাবু সব আমাকে চিনে, তু তো দো দিন কা ছোকরা?

আমি দু দিনের ছোকরা ?

- না তো কি আছিস? আভি তো তুহার হাত ভি তন্দরুস্ত হোয়নি, ওইভাবে জানালা ভেঙে কেউ ঢোকে? এইসব আওয়াজ কিয়া যে মালুম হুয়া চোর নেহি ডাকু গিরা।

এঃ আমাকে বিদ্যে শেখাচ্ছে! তা তুমি কী করে ঢুকলে?

হামি তুহার মতো থোড়াই আছি, আমি যখন কুনও বাড়িতে ঘুসব তো অ্যায়সা চুপচাপ ঘুসে যাবে যে কুত্তা ভি ডাকবে না।

জগা একটু দমে গেল, লোকটা হয়তো সত্যিই তার চেয়ে পাকা লোক, নামটাও তার চেনা-চেনা ঠেকছে। একটু দমে গিয়েও সে বলে ফেলল, মাপ করে দাও দাদা, ঢুকেই যখন গেছি তখন ভাইটিকে বঞ্চিত করবে কেন? আধাআধি বখরা হোক ।

রামপ্রসাদ বলল, আই ব্যাপ! আধা হিস্যা? তু তো খুনিয়া আছিস রে জুগুয়া।

কেন প্রস্তাবটা কি খারাপ?

দো-পাঁচ রুপয়া লিয়ে ভেগে যা।

এবার সত্যিই ভারি রেগে গেল জগা। বেশ হেকে বলল কী বললে! দো প্যাচ রুপেয়া! হোঃ!

রামবিলাস বেশ ঠাণ্ডা গলাতেই বলল, তো কত লিবি? বিশ রুপেয়া হোলে খুশ তো! তাই লিয়ে যা, উখানে জামাইদাদার ম্যানিব্যাগটা পড়িয়ে আছে টেবিলের টানার মধ্যে। পাঁচশ রুপেয়া আছে, হামি দেখে নিয়েছি, তু বিশ রুপেয়া গিনকে লিয়ে যা।

জগা ফ্যাঁচ করে উঠল, আর সোনার বোতাম, হাতঘড়ি সুটকেস? সেগুলো সব তুমি গায়ব করবে ভেবেছো? অত সোজা নয়। আমি তাহলে চোর-চোর বলে চেঁচাব।

জগাকে চেঁচাতে হল না, তাদের কথাবার্তা বে-খেয়ালে এত উঁচু গ্রামে উঠে গিয়েছিল যে জামাইবাবাজি উঠে পড়লেন ধড়মড় করে।

কে? কে রে ঘরের মধ্যে কথা কয়? অ্যাঁ! চোর নাকি? চোর নাকি হে? এ তো ভারি আস্পদা দেখছি হরিপুরের চোরদের! আমি হলুম হারু রায়, আমার ঘরে চোর ঢেকে কোন সাহসে শুনি? জানিস শ্বশুরবাড়ির গাঁ না হয়ে আমার গাঁ মল্লিকপুরে হলে এতক্ষণে তোদের থামে বেঁধে জলবিচুটি দেওয়াতাম?

রামপ্রসাদ চাপা গলায় বলল, সত্যনাস কিয়া রে জাগুয়া! হামার নাগরা জুতিজোড়া কুথ রাখিয়েছি ইয়াদে আসছে না।

ওঃ এই তো মুরোদ, চোর নিজের জুতো খুঁজে পায় না, সে আবার আমাকে চুরি শেখাতে আসেন!

বলে গদগদ হয়ে জগা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, জামাইবাবুর কাচা ঘুমটা ভাঙাতে হল—বড় দুঃখের কথা।

পট করে একটা জোরালো টর্চের আলো এসে মুখের ওপর পড়ল।

তুই কে?

আজ্ঞে আমরা পাড়া-পড়শির মধ্যেই পড়ি।

ঘরে ঢুকেছিস যে! হ্যা!

মাথা নেড়ে জগা বলল, আজ্ঞে দায়ে পড়ে ঢুকেছি, বাইরে থেকে মেলা ডাকাডাকি করেছি। তা দেখলুম বাদলার রাতটিতে আপনার ঘুমটিও বেশ জমাটিই হচ্ছে। একেবারে ক্ষীরের মতো জমাট ঘুম! হওয়ারই কথা, শ্বশুরবাড়িতে ভালমন্দ পেটে পড়েছে তার ওপর লেপের ওম। ঘুমের আর দোষ কী ?

জামাই হেঁকে উঠল, বাজে কথা রাখো। কী চাও?

জিব কেটে জগা বলল, আরে ছিঃ ছিঃ, চাইব কি? গরিব বটে, কিন্তু মাগুনে মানুষ নই। বুঝলেন।

বুঝলাম, তুমি মহাশয় লোক।

আজ্ঞে তা যা বলেন, তবে কিনা পাড়া-পড়শির বিপদে আপদে না এসে উপায়ই বা কী বলুন !

বিপদ! কিসের বিপদ হে?

আজ্ঞে সেই কথাটাই বলতে আসা। মাঝরাতে চেঁচামেচি শুনে বাদলা মাথায় করে ছুটে এসেছি। আমাদের শহিদখুড়োর শরীরটা বড্ড খারাপ। এখন তখন অবস্থা, এই যাব কি সেই যাব, একেবারে ধড়ফড় করছেন।

বলো কী? কই কিছু টের পাইনি তো! আজ্ঞে উঠোনের ওপাশের ঘরে মেলা লোক জড়ো হয়ে গেছে, আপনি জামাইমানুষ বলে শাশুড়িঠাকুরণ খবর দিতে লজ্জা পাচ্ছেন, তা আমি বললুম, সে কি কথা! জামাই হল আপনার জন্য। খবরটা কি তাকে না দিয়ে পারা যায়? তা এসে দেখি আপনি বড্ড ঘুমোচ্ছেন। মেলা ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া গেল না, তাই অগত্যা জানালাটা খুলে ঢুকে পড়েছি।

জামাই ভারি ব্যস্ত হয়ে বউকে ডাকতে লাগল, ওগো, ওঠো, ওঠো, শ্বশুরমশাই যে চললেন।

অ্যাঁ! বলে শহিদলালের মেয়ে উঠে পড়ল, তারপর দুজন কুড়মুড় করে দরজা খুলে বেরিয়ে ঝড়জলেই উঠোন পেরিয়ে ছুটল। রামপ্রসাদ জ্বলজ্বল করে চেয়েছিল জগার দিকে। জগা তার দিকে চেয়ে বলল, এঃ, চুরি শেখাতে এয়েছেন, দিয়েছিলে তো কাজ ভণ্ডুল করে!

রামপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ঠিক আছে রে জগুয়া, তুহার আধা হিস্যা।

১৫তম পরিচ্ছেদ

রামপ্রসাদ আর জগা চটপট মালপত্র হাতিয়ে নিয়ে বেরোতে যাবে। এমন সময় রামপ্রসাদ বলে উঠল,"আরে ভাই, হামারা জুতি কাঁহা গিয়া?"

জগা বলল, "তখন থেকে জুতো-জুতো করে চেঁচিয়ে মরছে দ্যাখো! কেমন চোর তুমি যে জুতো খুলে চুরি করতে ঢোকো? চুরি তো আর পুজো আচ্চা নয় যে জুতো খুলতে হবে!"

"তু দো দিনক ছোকরা, তু কুছু জানিস না। হামারা নাগরা জুতির এইসান আওয়াজ হয় কি মুর্দা ভি উঠকে বৈঠেগা, তাই লিয়ে জুতি খুলকে ঢুকতে হয়।"

"তা আমন বিটকেল জুতো পরোই বা কেন?"

"অ্যায়সা নাগরা জুতি কাঁহা মিলবে রে? তুদের মতো জুতি থোড়াই আছে। হামারা মুলক লালগোপালগঞ্জকা সীতারাম চামরিকা আপনা হাথে বনায়া গয়া চিজ। নিচে চালিশ গো বুলাকি হ্যায়, উস জুতি বিশ-পঁচিশ সালমে ভি কুছ নেহি হোগা।"

জগা খিঁচিয়ে উঠে বলল, "তবে জুতো নিয়েই থাকো, আমি চললাম। বাড়ির লোকজন লাঠিসোটা নিয়ে এল বলে।"

রামপ্রসাদ খুব দুঃখের গলায় বলল, "জুতির তু কী জানিস রে জগুয়া ! তু তো নাঙ্গা পায়ে ঘুরে বেড়াস।"

কথাবার্তার মধ্যেই বাইরে একটা শোরগোল শোনা গেল। কারা যেন চেঁচাচ্ছে। কে একজন হেকে বলল, "খবর্দার, পালাতে যেন না পারে। বল্লম দিয়ে গেঁথে ফেলবি, বাড়ি ঘিরে ফেল এক্ষুনি "।

জগা আর রামপ্রসাদ দুজনে জানালার কাছে পৌঁছে চোখের পলকে জানালা গলে বাইরে পড়ল। তারপর আমবাগানের ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল দুজনে।

"এ জগুয়া, কাঁহা যাচ্ছিস রে?"

"আর কোন চুলোয় যাব! নিজের বাড়ি যাচ্ছি।"

"হাঁ হাঁ, তো হামাকে ভি লিয়ে যাবি তো !"

জগা তেতো গলায় বলে, "তা আসতে হয় এসো, তবে তা বলে সেখানে জামাই-আদর পাবে না কিন্তু " ।

"ভাত খেলাবি তো !"

"এত রাতে ভাত কোথায় পাব ? চিড়ে আর গুড় দিতে পারি।"

"থোড়া দুধ মিলবে নাই ?"

"এঃ, দুধ ! তোমার বায়নাক্কা তো কম নয় ?"

রামপ্রসাদ ভারি বিরক্ত হয়ে বলে, "তু তো একদম ছোটমোটা চোর আছিস রে জগুয়া। হামার বাড়িতে যাবি, দেখবি ছোঠো ভেস, তিনগো গাই, চার বকরি, সবসুদ্ধ আছে।"

"ছোট চোর বলে কি তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছ নাকি? বেশ তাহলে আমার বাড়ি গিয়ে তোমার কাজ নেই। তুমি রাস্তা দ্যাখো।"

"গুসসা হল নাকি রে তুহার? আরে ঠিক আছে, তুকে হামি আইস চোরি শিখিয়ে দিব যে তু ভি ভেইস গাই সব কিনতে পারবি।"

জগা ঘরে এসে একটা কুপি জ্বালল। তারপর দুজনে বসল চুরির জিনিসপত্র দেখতে।

পাঞ্জাবির সোনার বোতামটা খুলে হাতে একটু নাচিয়ে নিয়ে জগা খুশির গলায় বলল, "ভরিখানেক হবে, কী বলো রামপ্রসাদদাদা?"

রামপ্রসাদ বোতামটা হাতে নিয়ে কুপির আলোয় একটু দেখে গম্ভীর হয়ে জিনিসটা জগার হাতে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "তু তো একদম বুরবক আছিস রে জগুয়া ?"

"কেন, বুরবকের আবার কী দেখলে?"

"উয়ো বুতাম সোনার থোড়াই আছে! উ তো গিলটি মাল।"

"অ্যাঁ !"

"উসি লিয়ে তো বলছি কি তু একদম বুরবক আছিস।"

"সুটকেসটা খুলে খানকতক জামাকাপড় পাওয়া গেল বটে, কিন্তু টাকাপয়সা টুঁটুঁ।"

জগা ভারি দুঃখের গলায় বলে, "জামাইটা তো বড্ড ঠকিয়েছে আমাদের দেখছি। শুনেছিলাম জামাই বড়লোক, মেলা পয়সা ।"

রামপ্রসাদ ঝাঁটা গোঁফের ফাঁকে হেসে বলল,"হাঁ হাঁ, বড়লুক আছে তো কী আছে? চোরচোট্ট কে লিয়ে কি সুটকেসের ভেতর রুপেয়া পইসা থোড়াই রাখবে? রুপেয়া পইসা আউর কৌন জঘায় রেখেসে। হামি হলে ঠিক বাহার করে লিতাম। তু ঘরে ঘুষে কাম বিলা করে দিলি।"

জগা ফোঁস করে উঠে বলল, "যত দোষ এখন আমার না? মানিব্যাগে পচিঁশ টাকাই ছিল। রামপ্রসাদ উদাস গলায় "উ তু লিয়ে লে। পঁচিশ রুপেয়া সে হামারা কী হোবে! তু ছোটামোটা চোর আছিস, তু হি লিয়ে লে।"

এ-কথায় ভারি অপমান বোধ করল জগা । বলল, “আমি ছোট চোর? আর তুমি কোন বড় চোরটা শুনি? আহা, আমাকে চুরি শেখাতে এলেন! নিজে তো নাগরা জুতোটা পর্যন্ত খুঁজে পেলে না!"

রামপ্রসাদ একটা শ্বাস ছেড়ে উঠে পড়ল। গাঁয়ের মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবিটা খুলে নিংড়ে নিয়ে গাটা একটু মুছে নিয়ে বলল, “তু আভি আরাম কর। হামি চললাম দুসরা শিকার চূড়তে।”

জগা অবাক হয়ে বলে, “বেরোচ্ছ! বাঃ চিড়ে গুড় খাবে না?”

“চুড়া গুড় দিয়ে কী হোবে রে জগুয়া? চুড়া গুড় বসে বসে খেলে কি কামাই হোবে?”

জগা টপ করে উঠে বলল, “কোথায় যাবে রামপ্রসাদদাদা, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।”

“তু তো কাম বিলা করে দিবি।”

“না, না, যা বলবে তাই শুনবো দেখো, মা-কালীর দিব্যি।”

“তবে শুনে লে। জবান বন্‌ধ রাখবি আর কোই খতরা হোলে মগজ ঠাণ্ডা রাখবি। হামি যৌন বলবে তাই করবি”।

“ঠিক আছে দাদা, তাই সই। এ যা রোজগার হল আজ তা একেবারে যাচ্ছেতাই। চলো যদি একটা দাঁও মারা যায়।”

ঝড় থেমে গেছে। বৃষ্টিটাও প্রায় ধরে এল। এখন টিপ টপ করে পড়ছে। জলকাদার রাস্তায় রামপ্রসাদ আর জগা পাশাপাশি হাঁটছে।

“কোন বাড়ি যাবে গো রামপ্রসাদদাদা ?”

“চল, ঢুঁড়ে লিব ।”

চাপা গলায় জগা বলে, “আহা আমি তো এগাঁয়েরই লোক। সব বাড়ি চেনা। কোন বাড়িতে কী কী মালকড়ি আছে তাও জানা। যে-বাড়ি চলো চোখ বুজে নিয়ে যাব।”

একটা জংলা জায়গা পেরিয়ে জমিদারবাড়ির ফটকের সামনে পড়ে জগা বলল, “এই হল জমিদার মহেন্দ্রচন্দ্রর বাড়ি...আর ওই যে হোমিওপ্যাথ বিশু দত্তর ঠেক। আর একটু এগিয়ে বাঁ ধারে যে পাকা বাড়িটা দেখবে সেটায় নয়ন হাতি থাকে—মস্ত পালোয়ান। আর ই যে...”

“তুকে বলেছি কিনা জবান বনধ রাখবি।”

“ও হ্যাঁ, তা তো ঠিক। আচ্ছা আর কথা কইব না।”

একটা মাঠকোটা পেরনোর সময়ে হঠাৎ একটা খুনখুনে সরু গলায় কে যেন বলে উঠল, “কে যায় রে বাপ, চোর নাকি?”

জগা টপ করে উবু হয়ে বসে পড়ল। সর্বনাশ! এ যে গোপেশ্বরের বুড়ি মা শীতলালক্ষ্মী !

বুড়ি ভারি মিঠে করে বলে, "চোর নাকি রে বাপ ! চোর হলে একটু ঘরে আয় বাছারা, জরুরী কাজ আছে।"

রামপ্রসাদ ফিরে তাকিয়ে জগাকে বসা দেখে চাপা গলায় বলল, "বসিয়ে আছিস কাহে রে? ভাগবি তো !"

জগা চাপা গলায় বলে, "ডাকছে যে !"

"সো হামি শুনিয়েছি। ঘরে ডেকে লিয়ে পিটাই করবে।"

"আরে না, না । বুড়ি একা একটা ঘরে থাকে।"

জানালা খুলে শীতলালক্ষ্মী দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের গাঁটে ব্যথা হয়ে গেল বাপ। কখন থেকে একটা চোরের জন্য হাপিত্যেশ করে চেয়ে আছি। তা চোরেরও কি আজকাল আকাল পড়ল? আয় বাছারা, ঘরে আয়, ভয় নেই, লোকজন ডাকব না।"

বুড়ি দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে দাঁড়াল। দু'জন গুটিগুটি এগোতেই এক গাল হেসে বলল, "আহা রে, ভিজে যে একসা হয়েছিস। আয়, গামছা দিচ্ছি, গা-মাথা মুছে বোস।"

হতভম্ব রামপ্রসাদ জগার দিকে চেয়ে বলে, "এ বুড়িয়া পাগলি আছে নাকি রে?"

"আরে না। চলোই না মজাটা দেখি, আমাদের রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে । যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন।"

"ও বাত তো ঠিক আছে।"

ঘরে ঢুকতেই শীতলালক্ষ্মী আহ্বাদে ডগমগ হয়ে বললেন, "বাঃ বাঃ একটা চোর চেয়েছিলাম, ভগবান একেবারে একজোড়া পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা বোস বাছারা, ঘন দুধ আছে, চিড়ে আছে, মর্তমান কলা আছে, ফেনী বাতাসা আছে, একটু ফলার করবি?"

"এ জগুয়া, ফল্লার কী চিজ আছে রে?"

"খুব ভাল জিনিস। বসে যাও।"

শীতলালক্ষ্মী দুটো আসন পেতে দিলেন মেঝেতে। তারপর দুটা জাম বাটিতে ঘন দুধ, অনেক চিড়ে, কলা আর বাতাসা দিয়ে বললেন, "খা বাছারা, আগে পেট ভরে খা, তারপর কাজের কথা হবেখন "।

১৬তম পরিচ্ছেদ

বহুকাল এমন খাবার খায়নি দুজনে। সরে ভরা ঘন দুধ, মর্তমান কলা, বাতাসা আর চিড়ে যে কী অমৃত তা বলে শেষ করা যায় না। শীতলালক্ষ্মী একেবারে মুক্তহস্ত হয়ে খাওয়াচ্ছেন। ফলে দুজনেরই দেদার খেয়ে পেট একেবারে টাই টাই হয়ে গেল।

শীতলালক্ষ্মী দুঃখ করে বললেন, আহা রে বাছারা, কতকাল বুঝি পেট ভরে খাসনি, তা কেমন চোর তোরা যে ভরাপেট খাওয়া জোটে না?

জগা করুণ গলায় বলে, ঠাকুমা, আমি খুবই ছিচকে আর ছোটোখাটো চোর, দিন চলে না।

শীতলালক্ষ্মী রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে বললেন, আর তুই! তুই কেমন চোর রে বাবা?

রামপ্রসাদ খুবই লজ্জার সঙ্গে মাথা নামিয়ে বলল, হামি তো বড়া চোর আছি বুড়িমা। হামার ঘর মে ছোটো ভেস, তিনগো গাই, চার বকরি, সবকুছ আছে।

তা বাবা, তোরা বড় চোর আর ছোটো চোর দুটিতে মিলে আমার একটা কাজ উদ্ধার করে দিবি?

হাঁ হাঁ, কিউ নেহি? বোলেন বুড়িমা, যে কাজ বলবেন করিয়ে দিব।

জগা বলল, আজ্ঞে শক্ত কাজ হলে আমি কি আর পেরে উঠব ঠাকুমা? ফলার খেয়ে যে নিজেকেই টেনে দাঁড় করাতে পারছি না!

একগাল হেসে শীতলালক্ষ্মী বললেন, ওরে, তোদের দেখছি মরা পেট। এটুকু আর কী খেলি বাছা? আমার দাদাশ্বশুর আস্ত পাঁটার মাংস খেয়ে উঠে আস্ত কাঁটাল দিয়ে দু'সের দুধের ক্ষীর খেতেন। তবে তাঁর ঢেঁকুর উঠত। আর কী ঢেঁকুরই উঠত বাপ, যেন বাঘ-সিংহী ডেকে উঠল। আমার শ্বশুরমশাইয়ের কথা শুনবি? আস্ত একথালা বিশসের কাতলা মাছের লেজ থেকে মুড়ো অবধি সাপটে খেতেন। তার পর এক হাঁড়ি দই আর পঞ্চাশটা রাজভোগ তাঁকে কতবার খেতে দেখেছি।

রামপ্রসাদ হাতজোড় করে বলল, উ সব দেওতা আছেন। হামি লোগ ছোটামোটা আদমি আছে বুড়িমা। যদি আউর খিলাবেন তো হামার দম নিকলে যাবে।

জগাও করুণ গলায় বলল, আজ আর নয় ঠাকুমা। অর্ধেকটা বাকি থাক, কাল আবার হবে খন।

আচ্ছা বাবারা, তোদের আর খেতে হবে না, তা বলি বাছারা, আমার একটা ছোটো কাজ করে দিবি?

আজ্ঞে বলে ফেলুন।

কাজ খুব সোজা, তোদের গাও ঘামাতে হবে না। সরলার বাড়ি চিনিস তো !

ঘাড় নেড়ে সোৎসাহে জগা বলল, খুব চিনি, খুব চিনি। ব্যস, তাহলে তো অর্ধেক কাজ হয়েই গেল।

পুরো কাজটা কী ঠাকুমা।

ওরে সে খুব সোজা কাজ। তার বালিশের পাশে একটা কাঠের বাক্স থাকে। ঘুম না ভাঙিয়ে বাক্সটা আমাকে এনে দিবি বাপ?

জগা বেশ জোরেই হোঃ হোঃ করে হাসল। তারপর বলল, কার ঘুম ভাঙাবো ঠাকুমা? তিনি তো কবেই পটল তুলেছেন।

ওমা ! বলিস কি? সরলা মরেছে কবে?

তা হল অনেক দিন।

ওমা! ছুড়ি তো এই সেদিনও এক্কাদোক্কা খেলত জামতলায়। একরত্তি বয়স।

জগা মাথা নেড়ে বলে, একরত্তিই বটে, তা একশ পুরে তার ওপর আর চার-পাঁচ বছর ধরুন।

শীতলালক্ষ্মীর গালে হাত। চোখ বড় বড় করে বললেন, বলিস কি রে মুখপোড়া ! সে যে আমার চেয়েও দশ-বারো বছরের ছোটো !

তা হতে পারে হতে বাধা কিসের?

হতে পারে মানে? সরলার যদি একশ চার হয় তাহলে আমার কত হচ্ছে?

জগা বলে, তা হবে একশ পনেরো-ষোলো। কিছু বেশিও হতে পারে।

ওরে বাপ রে ; এত বয়স হয়ে গেল নাকি রে আমার! তা কেউ তো বয়সের কথাটা আমাকে বলেনি এতদিন। সরলা যে মরেছে সেও তো টের পেলুম না। হ্যাঁ রে বানিয়ে বলছিস না তো!

জগা এক গাল হেসে বলে, না ঠাকুমা, বানিয়ে বলব কেন? দু-চার বছর এদিক ওদিক হতে পারে, তবে মোটামুটি হিসেবটায় খুব গণ্ডগোল পাবেন না। সরলা ঠাকুমা বেঁচে থাকতে তো ও বাড়িতে কম ঘুরঘুর করিনি। রাতবিরেতে গেলে সরলা ঠাকুমা ঘরের ভেতর থেকে কথাবার্তাও বলতেন। তখনই বলেছিলেন, তাঁর তখন একশ চার চলছে। তাও ধরুন চার পাঁচ বছর তো হয়েই গেল। বেঁচে থাকলে সরলা ঠাকুমার বয়স একশ দশটশই হত।

শীতলালক্ষ্মী তাড়াতাড়ি দুহাতে কান চাপা দিয়ে বললেন, রক্ষে কর, বয়সের হিসেব আর শুনতে চাই না। ফস করে আবার চার-পাঁচ বছর বেড়ে যাবে। যা ছিল তাই থাক।

থাকল ঠাকুমা, তা কিসের বাক্সের খোঁজ করছিলেন যেন?

সরলার বাড়িতে একখানা কাঠের বাক্স আছে রে বাপ। সে যক্ষীবুড়ির মতো আগলে রাখে। ওই বাক্সখানা যদি এনে দিস বাপ, তবে বুড়ো বয়সে একটু সুখে মরতে পারি।

বাক্সে কী আছে গো ঠাকুমা যে সুখে একেবারে ভেসে যাবেন!

ধনরত্ব নয় রে বাবা, সেদিকে টুটু বাক্সের মধ্যে আছে সাতটা কড়ি আর সাতটা তামার পয়সা।

রামপ্রসাদ আর জগা পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর রামপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, উ বাক্সো তো গায়েব হয়ে গেছে ঠাকুমা।

অ্যাঁ ! গায়েব হয়ে গেছে মানে ! গায়েবটা করল কে?

রামপ্রসাদ উদাস গলায় বলল, ক্যা মালুম! উসি বাক্স লিয়েই তো হামি মুলুক থেকে এতো পরেসান হয়ে আসলাম। কিন্তু ঐ বাড়ির মধ্যে ছোটো গুণ্ডা লোক ঘুসে বৈসে আছে। আজ হামাকে পাকড়েছিল। দুচার ঘুসস ভি মারল। তো বুড়ি মা, ওই সাতটো কড়ি আর সাতটো পইসার বেপারটা কী আছে বলুন তো!

শীতলালক্ষ্মী খুবই ভাবিত হয়ে পড়ে বললেন, সে বাছা বলে আর কী লাভ?

জগা বলল, ওই বাক্সটা নিয়ে খুব কথা হচ্ছে গো ঠাকুমা। কোন হাতি ঘোড়া হবে বাক্সটা দিয়ে?

শীতলালক্ষ্মী দুঃখের গলায় বললেন, হত তো অনেক কিছুই রে বাপ। কিন্তু আর তো কিছু হওয়ার নয়।

বাক্সের রহস্যটা কী ঠাকুমা ?

সে আছে বাছা। ভেঙে বলা যাবে না ।

কেন ঠাকুমা? অসুবিধে কী?

শীতলালক্ষ্মী মুখখানা তোম্বা করে বললেন, আমিই কি তার সবটা জানি রে বাছা? তবে শুনেছি, সাতপয়সার হাট নামে একটা গ্রাম আছে। সেখানে সাতকড়ি নামে একটা লোক থাকে।

তারপর ?

আমি ঐটুকু জানি। বাকিটুকু ওই সাতকড়ি জানে।

মাথা নেড়ে রামপ্রসাদ বলল, সমঝমে আসছে না বুড়িমা।

জগা বলল, আমিও বুঝতে পারছি না। সাতপয়সার হাট নামে কোনও গ্রামের নাম জন্মেও শুনিনি।

শীতলালক্ষ্মী বলল, ওরে আছে, আছে। সে যে মস্ত ডাকাতের গাঁ ছিল।

সে কবে ছিল কে জানে। আপনি তো আর আজকের লোক নন। কত যেন বয়স বেরোলো আপনার হিসেবে! দেড়শো নাকি ঠাকুমা?

ওরে বলিসনি, বলিসনি! শুনলে হৃৎকম্প হয়। আমার কথাটা ভাল করে শোন। বাক্সখানা কিন্তু সরলার নয়।

তবে কার?

সরলা দুটো চোরকে লাগিয়ে নিতাই পালের বাড়ি থেকে চুরি করিয়ে আনিয়েছিল।

নিতাই পাল?

হ্যাঁ রে বাবা, নিতাই পাল। কিন্তু ও জিনিস নিতাই পালেরও নয়। তবে কার? শোনা যায়, নিতাই পাল ওটা কোন কাপালিকের কাছ থেকে চুরি করে এনেছিল।

ও বাবা ! একটা বাক্সের জন্য এত?

হ্যাঁ রে বাবা, ও বাক্স বড় সামান্য নয়।

তাহলে এখন কী করব ঠাকুমা?

বাক্সটা কে চুরি করল এটুকু খুঁজে দেখবি বাবা?

জগা মাথা চুলকে বলল, সাতপয়সার হাট আর সাতকড়ি যখন জানা গেছে তখন বাক্সটা না হলেও চলবে। রহস্য তো ভেদ হয়েই গেছে।

শীতলালক্ষ্মী বললেন, না রে না, ওই বাক্স না নিয়ে গেলে সাতকড়ি যে রা কাড়বে না।

আহা, সাতটা কড়ি আর তামার পয়সা জোগাড় করা তো আর শক্ত নয়। কাঠের বাক্সও মেলা পাওয়া যাবে।

তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই বাপু। এই বুদ্ধি নিয়ে চুরি করে বেড়াস! এই জন্যই তোর কিছু হয় না। ওই কড়ি আর পয়সা আর পাঁচটা কড়ি আর পয়সার মতো তো নয়। ওর মধ্যে অনেক কারিকুরি আছে। তেমন চোখ নাহলে ধরতে পারবি না।

১৭তম পরিচ্ছেদ

ভোর না হতেই সুজনের বাড়িতে মেলা লোক এসে হাজির। নগেন দারোগা, গদাই নস্কর, পবনকুমার, মহেন্দ্রচন্দ্র দেবরায়, শহিদলাল, নয়ন হাতি, বজ্র সেন এবং রামহরিও, সকলেই বেশ উদ্বিগ্ন।

নগেন বললেন, "আগেই বলেছিলুম আপনাকে, বাড়িতে পাহারা বসিয়ে দিই, তা হলে আর বিপদটা হত না। তা লোকগুলোর চেহারার একটা বিবরণ দিতে পারেন কি?"

সুজনের মাথায় ব্যান্ডেজ, শরীরও দুর্বল। মৃদু হেসে বললেন, "না, তাদের মুখ ঢাকা ছিল। ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই মাথায় কী দিয়ে যেন মারল। আর কিছু মনে নেই।"

"কী কী নিয়ে গেছে ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?"

"এখন ততটা জোর পাচ্ছি না গায়ে। তবে আমার বাড়িতে দামি জিনিস তেমন কিছু থাকে না। একটা ঘড়ি পাচ্ছি না মনে হচ্ছে।"

"আলমারিটা নাকি ভাঙা ছি ?"

"হ্যাঁ, তাও ছিল। তবে বেশি কিছু নেয়নি।"

হঠাৎ রামহরি বলে উঠলেন, "আপনার ঘরে নেই-নেই করেও দামি জিনিস বেশ কিছু আছে। ডাকাতরা তেমন কিছু নেয়নি, এটা খুব আশ্চর্যের কথা, এমন নয় তো যে, ওরা একটা বিশেষ কোনও জিনিসেরই খোঁজে এসেছিল?"

সুজন রামহরির দিকে চেয়ে বললেন, "কাল আপনি সময়মতো না এলে আমার কপালে আরও কষ্ট ছিল। আপনার কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ কিন্তু ঘটনাটা চাউর করতে যে বারণ করেছিলাম আপনাকে!"

মহেন্দ্র একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনি অদ্ভুত লোক মশাই, বাড়িতে ডাকাত পড়ল আর আপনি সেই ঘটনাটাও চেপে যেতে চাইছেন? লোককে ডাকাত সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়াও কি আপনার কর্তব্য নয়? আর গোপন করতে চাইছেনই বা কেন?"

সুজন খুব মৃদুগলায় বললেন, "আসলে আমি নিজেই একটু তদন্ত করতে চাইছিলাম। চাউর হয়ে গেলে ডাকাতরা সাবধান হওয়ার সুযোগ পাবে।"

নগেন দারোগা বললেন, "এটা আপনার ভুল ধারণা। ডাকাতরা—যদি তারা সত্যিই সেরকম ডাকাত হয়ে থাকে—পাবলিসিটিতে ঘাবড়ায় না। তা ছাড়া একা-একা আপনি কী তদন্তই বা করবেন? আপনার কি পুলিশের ট্রেনিং আছে?"

সুজন মাথা নেড়ে বললেন, "না নেই! তবে আমার সঙ্গে এ-গাঁয়ের এবং আশেপাশের গাঁয়ের চোর-ডাকাতদের সঙ্গে একটু চেনাজানা আছে। ভাবছিলাম তাদের কাজে লাগিয়ে যদি কিছু করা যায়।"

“ওটা রিস্কি ব্যাপার সুজনবাবু। আমরা আর রিস্ক নেব না। আপনার বাড়িতে আমরা আজ রাত থেকে দুজনকে পাহারায় রাখব।”

সুজন উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "রক্ষে করুন। আমি বুড়ো হয়েছি। আমার প্রাণের মূল্য কী? পাহারাদাররা বিপদে পড়তে পারে।”

নয়ন হাতি আর বজ্র সেন একসঙ্গে বলে উঠল, “না হয় আমরাই পাহারা দেব। আমাদের বিপদ সহজে হবে না।”

সুজন ডাইনে বাঁয়ে মাথা নেড়ে বললেন, “না না, আমার পাহারার কোনও প্রয়োজন নেই। ঠিক আছে, আমার লোক আমি নিজেই ঠিক করে নেব।"

নগেন দিজ্ঞেস করলেন, “তারা কারা?”

সুজন মৃদু হেসে বললেন, “নাম না-ই বা শুনলেন। আপনার চোখে তারা ভাল লোক নয়, কিন্তু আমার খুব বিশ্বাসী আর অনুগত।”

“ভাল হলেই ভাল। আমরা আপনার নিরাপত্তা ছাড়া আর কিছু চাই না।”

“আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।"

নগেন দারোগ বললেন, “শুনেছেন বোধহয় যে, সরলা পিসির বাড়িতে কিছু সমাজবিরোধী থানা গেড়েছিল। কাল রামহরিবাবু বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাতে ও বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজের কানে শুনেছেন, ভেতরে একটা চোরকে পাকড়াও করে আর এক চোর খুব ধমক-চমক করছে। এবং কথা হচ্ছিল শূলপাণির সেই বাক্সটা নিয়ে, যাতে সাতটা তামার পয়সা আর সাতটা কড়ি ছিল। বুঝতে পারছি না, সেই বাক্সটা নিয়েই বা এত খোঁজখবর হচ্ছে কেন।”

সুজন বললেন, “ওসব বোগাস ব্যাপার, কিছু লোক গুপ্তধনের লোভে মরিয়া হয়ে ওসব করছে।”

মহেন্দ্রচন্দ্র হঠাৎ বললেন, “সুজনবাবুর ওপর হঠাৎ এই হামলাটা হল কেন সেটার পুলিশ তদন্ত হওয়া দরকার, সুজনবাবু ব্যাপারটাকে কেন গুরত্ব দিতে চাইছেন না তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমরা গুরুত্ব না দিলে ভুল করব, এরকম হামলা অন্যের ওপরেও হতে পারে।”

আরও আধঘণ্টা বাদে সবাই নানারকম আশঙ্কা, সান্তনা আর দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নিলেন, এক ঘরে সুজন একটু থমথমে মুখ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর উঠে একটু কফি করে খেলেন। তারপর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ নিয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন। সাতকড়ি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু সাতটা পয়সার রহস্য ভেদ করা যাচ্ছে না।

দুপুরের দিকে পেছনের জানালার ওপাশে একটা মৃদু গলা খাঁকারির শব্দ পাওয়া গেল।

সুজন চোখ মেলে বললেন, “পাগলু নাকি ?”

“যে আজ্ঞে ”

“ভেতরে এসো ”।

পাগলু খুব অমায়িক মুখ করে ঘরে এল। মুখে একটু বশংবদ হাসি ।

“খবর কী পাগলু?”

“আজ্ঞে, খবর আছে, তবে এবার বন্দোবস্তের কথাটা হয়ে যাক সুজনবাবু। ”

“কিসের বন্দোবস্ত ?”

“ধরুন, যদি গুপ্তধন পাওয়াই যায় তা হলে আমাদের বখরটা কীরকম হবে?”

সুজন একটু হাসলেন, বললেন, “গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল, ওটা আদৌ গুপ্তধনের সংকেত কি না তাই তো ভাল করে জানা গেল না।”

“সে তো ন্যায্য কথাই। পাওয়া না গেলে বখরার কথাই উঠবে না। কিন্তু ধরুন, যদি পাওয়া যায়, তা হলে?”

“তা হলে কত চাও?”

“আমাদের বখরা আধাআধি ।"

সুজন ফের হাসেন, “আধাআধি? বেশ তাই হবে।”

“কথা দিচ্ছেন?”

“দিলাম। এবার খবরটা কী বলবে?”

“বলতেই আসা। কাল রাতে আমার স্যাঙাৎ জগা আর বাইরে থেকে আসা একটা চোর রামপ্রসাদ শীতলালক্ষ্মীর ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। বুড়ি চোর খুঁজছিল।”

“চোর খুঁজছিল?”

“তাজ্জব ব্যাপার ”

“আজ্ঞে, তাজ্জবই বটে। তা বুড়িও ওই বাক্স চায়।”

“তাই নাকি ! কেন চায় ?”

“বুড়ির কাছেই জগা শুনেছে যে, ওই সাতপয়সার সংকেত হল সাতপয়সার হাট নামে একটা জায়গা। সেখানে সাতকড়ি নামে একটা লোক থাকে। তার কাছে গিয়ে হাজির হতে পারলে আর চিন্তা নেই।”

“সাতপয়সার হাট! সেটা কোথায়?”

পাগলু মাথা নেড়ে বলল, “সেইটেই জানা নেই। আশেপাশে কোথাও সাতপয়সার হাট বলে কোনও জায়গার কথা শোনা যায় না।”

“বুড়ি এত কথা জানল কী করে ?”

“তা বলতে পারি না। তবে শীতলালক্ষ্মীর বয়স অনেক। পুরনো আমলের মানুষ। কিছু কানাঘুষো শুনে থাকবে।”

“সাতপয়সার হাটটা কোথায় না জানলে তো কিছু করা যাবে না। জায়গাটার পাত্তা লাগাও পাগলু।"

“যে আজ্ঞে। পাত্তা লাগলেই এসে বলে যাব। কিন্তু একটু বাঁধাও আছে।”

“কিসের বাধা ?”

“শীতলালক্ষ্মী বলেছে, শুধু জায়গাটা বা সাতকড়ি নামের লোকটাকে খুঁজে পেলেই হবে না, ওই বাক্স আর কড়ি আর পয়সা নিয়ে না গেলে সাতকড়ি পাত্তা দেবে না। ওই সাতটা পয়সা আর কড়িই নাকি আসল জিনিস।"

সুজন চিন্তিতভাবে বললেন, “বুঝতে পারছি রহস্যটা আরও জট পাকিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘটনাটা যদি অনেক কাল আগের হয় তা হলে সাতকড়িই কি বেঁচে আছে এতদিন? তবু খোঁজ করতে থাকো। আমিও খোঁজখবর করছি।”

“যে আজ্ঞে।" বলে পাগলু বিদায় নিল।

১৮তম পরিচ্ছেদ

জগা আর রামপ্রসাদের এক রাত্তিরেই বেশ ভাব হয়ে গেছে। রামপ্রসাদ দুপুরে জগার ঘরে খেতে বসে বলল, আরে এ জগুয়া, তু কি রোজ এইসন খানা খাস নাকি রে বেওকুফ?

জগা কাঁচুমাচু হয়ে বলল, আমি গরিব মানুষ, এর চেয়ে আর বেশি কী করতে পারি বলো তো রামপ্রসাদদাদা?

ডাল ভাত আর আলুর ছেঁচকি দিয়ে একটা বড় গরাস সাপটে মুখে তুলে রামপ্রসাদ বলল, এইসন খানা খেলে তোর শরীরে তাকৎ আসবে থোড়াই! ছোটমোটা কাম ছোড়িয়ে দে জগুয়া, বড় বড়া কাম কর।

জগা একটু উজ্জ্বল হয়ে বলে, একটা বড় কাজ হাতে আছে, বুঝলে রামপ্রসাদদাদা? কাজটা করতে পারলে নগদ বিশ হাজার টাকা।

কী কাম রে জগুয়া?

একজন বুড়ো মানুষকে খুন করতে হবে।

আরে রাম রাম! খুন উন খারাপ কাজ আছে। চোর কা ভি কুছ ধরম হ্যায় রে বুরবক। খুন কাহে করবি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগা বলল, করতে আমারও মন চাইছে না, বুঝলে? কিন্তু দিনু গুণ্ডা কি ছাড়বে ভেবেছো? আগাম ধরিয়ে দিয়ে গেছে, কাজটা করতে না পারলে ব্যাটা আমার মুণ্ডু না নামিয়ে দেয়।

ছিয়া, ছিয়া, খুন খারাবি কি কোই মরদকা কাম আছে রে?

কী করব বলে তো! দিনু ব্যাটা কবে এসে হাজির হয় তার ঠিক নেই।

তু হিয়াসে ভাগ যা জগুয়া।

ভেগে কোথায় যাবো? কোন চুলোয় কে ঠাঁই দেবে আমায় বলো তো!

তু হামার মুলুকমে চল।

গিয়ে?

ভেস চরাবি, গাই দেখবি, খেতি কা কাম করবি, আউর রাত মে থোড়াবহৎ চোরিওরি ভি করবি, ভেসকা দুধ পিয়ে অ্যাইসা তাকৎ হোবে যে দশ-বিশ জোয়ানের সঙ্গে লড়াই করতে পারবি।

আমাকে চাকর খাটাতে চাও নাকি?

আরে নেহি নেহি চাকর থোড়াই বলবি। আধা বখরা হোবে।

মাথা নেড়ে জগা বলে, না গো রামপ্রসাদদাদা, যে আমি পারব না। হরিপুর ছেড়ে কোথাও গিয়ে আমার মন টিকবে না।

দুজনে খাওয়া শেষ করে উঠে সবে একটু চাটাই পেতে গড়িয়েছে হঠাৎ বাইরে হুংকার শোনা গেল, জগা! অ্যাই জগা!   জগা ধড়মড় করে উঠে বলল, ওরে বাপ !

রামপ্রসাদ নিমীলিত চোখে চেয়ে বলল, কৌন চিল্লাচ্ছে রে?

সাক্ষাৎ যম। ওই তো দিনুগুণ্ডা।

রামপ্রসাদ মিটমিট করে চেয়ে বলল, কেমন গুণ্ডা?

বহৎ গুণ্ডা।

বাইরে ফের হাঁক শোনা গেল, জগা ! অ্যাই জগা! দরজা খোল বলছি।

জগা উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে চোখ কচলাতে কচলাতে বলল, আরে দিনুদাদা যে!

দিনু তার পেল্লায় চেহারাটা নিয়ে দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে বলল, আজ রাতেই কাজ সারতে হবে। আর সময় নেই।

আজ রাতে ! কিন্তু আজ যে আমার একাদশী ! এই দিনটায় অন্ন ছুই না যে।

দিনু তার ঘাড়টা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আজ আবার কোন পঞ্জিকার একাদশী রে বদমাশ? আমাকে একাদশী চেনাচ্ছিস?

ঝাঁকুনির চোটে চোখে সর্ষেফুল দেখে জগা চি চি করে বলল, আহা ছাড়ো ছাড়ো দিনুদাদা, তোমার মামার বদলে আমিই যে টেঁসে যাবো!

তোর ঘরে ওটা কে রে?

ওঃ উনি হচ্ছেন রামপ্রসাদ সিং, ভুসওয়ালের দারোগা।

দারোগা!

আজ্ঞে, ছদ্মবেশে রোঁদে বেরিয়েছেন।

শুনে দিনুগুণ্ডা কোমরে হাত দিয়ে এমন হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য করল যে বাইরে কাকেরা ভয় খেয়ে কা-কা করতে লাগল।

দারোগা! বটে! অ্যাই রামপ্রসাদ, উঠে আয় তো দেখি, আয় এদিকে !

রামপ্রসাদ তাড়াতাড়ি উঠে হাতজোড় করে বলল, রামরাম বাবুজী !

তুই নাকি দারোগা?

রামপ্রসাদ হাতজোড় করেই বলল, নেহি মালিক, জগা ঝুট বলছে।

তাই বল! কাল যখন সরলাবুড়ির বাড়িতে ঢুকেছিলি তখন এই শর্মার হাতে পড়ে তো চি চি করছিলি, ছিঁচকে চোর কোথাকার!

জী হজৌর ! ছোটামোটা চোর আছে মালিক।

এ গাঁয়ে এখনও ঘুরঘুর করছিস, তোর তো খুব সাহস ! কাল যে তোকে নাকে খৎ দেওয়ালাম, তুই যে বললি রাতেই এ গাঁ ছেড়ে চলে যাবি !

উ বাত তো ঠিক আছে মালিক, কাল আপনার ঘুসসা খেয়ে হাত পাওমে দরদ হচ্ছিল, থোড়া আরাম করিয়ে নিলাম। আজ চলিয়ে যাবো মালিক।

দিনু ঘরে ঢুকে চারদিকে চেয়ে দেখে বলল, এই ঘরে থাকিস নাকি রে জগা?

আজ্ঞে !

ছোঃ।

বড্ড নিচু নজর তোর। এভাবে কেউ থাকে?

আজ্ঞে, অবস্থাটা খারাপই যাচ্ছে।

কাজটা করে ফেল, তোর ভাগ্যের চাকা ঘুরে যাবে।

আজ্ঞে।

কী করতে হবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভাল করে শোন। ভুলভাল হলে বিপদ আছে

আজ্ঞে বলুন।

ঠিক রাত আটটায় বেরোবি।

মনে থাকবে?

যে আজ্ঞে।

গাঁ থেকে উত্তরে তিন ক্রোশ গেলে পঞ্চসায়রের জঙ্গল পড়বে, চিনিস?

চেনা চেনা ঠেকছে।

মারব গাঁট্টা। পঞ্চসায়রের জঙ্গল চেনে না এমন লোক কে আছে এখানে?

আজ্ঞে চিনি।

পঞ্চসায়রের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কোশটাক গেলে রায়দিঘি।

আজ্ঞে।

রায়দিঘি থেকে ডানহাতি দক্ষিণের রাস্তা ধরে নাক বরাবর গেলে একটা হাট দেখতে পাবি।

হাট?

লোকে বলে ওটা গগনচাঁদের হাট।

মনে থাকবে।

আগে জায়গাটার নাম ছিল সাতপয়সার হাট।

অ্যাঁ।

চমকে উঠলি যে বড়?

জগা নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, আজ্ঞে ও কিছু নয়।

সাতপয়সার হাট বহু পুরনো জায়গা। দেখবি সব পুরনো আমলের বাড়ি-ঘর আর মন্দির-টন্দির আছে। জায়গাটা খুবই অখাদ্য। মশামাছি আর জোঁকের খুবই উপদ্রব।

যে আজ্ঞে |

সেখানে বুড়ো শিবমন্দিরের পেছনে একটা পাঁচশো বছরের পুরনো বাড়ি দেখতে পাবি।

যে আজ্ঞে।

সেই বাড়িতেই আমার মামা থাকে। সাতানব্বই বছর বয়স। বুঝলি?

আজ্ঞে জলের মতো।

মামার নাম সাতকড়ি গায়েন।

অ্যাঁ !

চমকে উঠলি যে বড়?

আজ্ঞে না, একটা মশা কামড়াল গালে, তাই।

ওই সাতকড়ি গায়েনই হল আমার শত্তুর। বুঝলি?

জলের মতো |

কাজটা খুব সোজা নয়। বরং বেশ কঠিন কাজই বলতে হবে।

যে আজ্ঞে।

মামার চারদিকে বেশ কঠিন পাহারা আছে।

ও বাবা, পাহারা থাকলে কী করব?

তুই বলবি সাতকড়ি গায়েনের কাছে তোর জমি বাঁধা আছে, তুই টাকা দিয়ে ছাড়াতে গেছিস।

বিশ্বাস করবে কথাটা?

খুব করবে।

দিনু পকেট থেকে একখানা তুলোট কাগজের টুকরো বের করে জগার হাতে দিয়ে বলল, এ কাগজটা দেখালেই তোকে পথ ছেড়ে দেবে।

তারপর কী করব?

সাতকড়ি গায়েন নিজের কাজ নিজেই করে। পাওনা গণ্ডার ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস করে না। সামনে হাজির হতে পারলে আর চিন্তা কিসের? একখানা দোধার ছোরা রেখে যাচ্ছি। ছোরাটা সোজা বুকে বসিয়ে দিবি।

ও বাবা !

ও বাবা আবার কী? ছোরাটা বসিয়েই চলে আসবি। জলের মতো সোজা কাজ।

১৯তম পরিচ্ছেদ

যাওয়ার সময় দিনু গুণ্ডা হাজারটা টাকা পকেট থেকে বের করে একরকম জগার নাকের ওপর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ছুড়ে মেরে বলল, নেমকহারামি করলে কিন্তু জান খিঁচে নেবো।

জগা জিব কেটে বলে, ছিছি, নেমকহারামি করবে কোন নেমকহারাম? নেমকহারামি ব্যাপারটা আমার আসেই না।

দিনু কটমট করে রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে বলল, অ্যাই মর্কট, ঘাপটি মেরে বসে তো সব শুনলি, এসব কথা আর পাঁচ কান হবে না তো !

জী নেহি। পাঁচ কান কিউ, দো কান ভি হোবে না।

ভাল কথা, জানাজানি হয়ে গেলে দুটো লাশই পুঁতে ফেলব।

জী হুজৌর।

কিন্তু শুনেই যখন ফেলেছিস, তখন তুইও কাজে লেগে যা। এসব কাজে একজনের চেয়ে দুজন থাকা ভাল। টাকাটা বরং ভাগাভাগি করে নিস।

রামপ্রসাদ অতি ধূর্ত লোক, চোখ মিটমিট করে বলল, বহুত আচ্ছা মালিক। লেকিন ভাগউগ আপনি নিজে করিয়ে দিন। জগা হামাকে থোড়াই ভাগ দিবে।

অ, অ্যাই জগা, দে ওকে ওই হাজার টাকা থেকে পাঁচশো দে, কাজটা আজই সেরে আয়, কাল বাকি টাকা নগদ বাড়ি বয়ে এসে দিয়ে যাবে।

জগা বেজার মুখে হাজার টাকা থেকে পাঁচশো টাকা রামপ্রসাদের হাতে দিয়ে বলল, যে আজ্ঞে।

তাহলে চললুম, কাজ যদি ভণ্ডুল করে আসিস তাহলে কী হবে বুঝতেই তো পারিস।

আজ্ঞে, সে আর বলতে !

দিনু চলে যাওয়ার পর জগা আর রামপ্রসাদ দুজনে পরামর্শে বসল।

জগা বলল, রামপ্রসাদদাদা, দিনু গুণ্ডা কি আমাকে ফাঁসাতে চাইছে? ছোটোখাটো চুরিচামারি করি বটে, কিন্তু এসব খুন জখম তো কখনও করিনি। তবু আমাকেই এত বড় কাজটা কেন দিল বলে তো!

রামপ্রসাদ একটা হাই তুলে বলে, তোর নসিব খারাপ আছে রে জগুয়া।'খুন করলে বিশ হাজার রুপিয়া তোকে থোড়াই দিবে দিনুগুণ্ডা, তুকে তো সাত পয়সার হাটের গাওয়াররা পিটতে পিটতে মেরে দিবে। পুলিশ ভি আছে, ফাঁসি ভি হতে পারে ।

তাহলে চলো, পাগলুদাদার কাছে যাই।

পাগলু কৌন আছে রে?

আমার মতোই একজন চোর। তবে বেশ বুদ্ধি রাখে।

বুদ্ধির দরকার হোলে তোকে হামি বুদ্ধি দিব। পাগলু অগলুসে বুদ্ধি নিবি কেন?

পাগলুদাদার বুদ্ধি তোমার চেয়েও ঢের বেশি। আমরা খুব বন্ধুও বটে। পাগলুদাদাই আমাকে প্রথম বুঝিয়েছিল, খুন-খারাপির কাজ না করতে। তখন

শুনিনি, টাকার লোভটা খুব বেশি হয়েছিল, পাগলুদাদার কাছে যাওয়ার আরও একটা কারণ আছে।

কৌন কারণ আছে?

পাগলুদাদা আর আমি একটা ধাঁধা মেলাতে পারছিলাম না। সেটা এবার মিলে গেছে। কথাটা পাগলুদাদাকে বলতে হবে।

রামপ্রসাদ আর দ্বিরুক্তি করল না। উঠে পড়ল। বলল, শুন জগুয়া, রাতের বেলা কুছ আচ্ছা খানাপিনা করতে হোবে।

খাওয়ার কথা এখন রাখো তো। আমার বলে বুক হিম হয়ে যাচ্ছে, উনি খাওয়ার গপ্পো ফেঁদে বসলেন। চলো তো, জরুরী কাজটা আগে সারি।

দুজনে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধের মুখে গাঁয়ের অন্য প্রান্তে পাগলুর বাড়িতে হাজির হল দুজন।

পাগলু বাড়িতেই ছিল। তাকে আড়ালে ডেকে সংক্ষেপে ঘটনাটা ভেঙে জগা বলল, সেই সাতপয়সার হাট আর সাতকড়ির সন্ধান পাওয়া গেছে পাগলুদা, এবার আমরা বড়লোক।

কোথায় পেলি?

দিনুগুণ্ডার মামাবাড়ি হল গে গগনচাঁদের হাট, আগে ওটারই নাম ছিল সাতপয়সার হাট।

বলিস কী?

হ্যাঁ।

আর দিনুর সাতানব্বই বছর বয়সী মামাই হল সাতকড়ি।

বটে !

এ তো সাঙ্ঘাতিক খবর।

তাই বলছি, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। তিনজনে মিলে কিছু একটা করা যাবে।

পাগলু একটু ভেবে বলে, সাত পয়সার হাট আর সাতকড়িকে তো পাওয়া গেল, কিন্তু সেই কাঠের বাক্স কোথায়?

সেটা না হলে তো আর সাতকড়ি আমাদের পুঁছবেও না।

পাগলুদাদা, আমি বলি কি, সাতটা পয়সা আর সাতটা কড়ি জোগাড় করা তো কোনও সমস্যা নয়। আর রায়দিঘির গজানন মিস্তিরির দোকান থেকে একটা কাঠের বাক্স কিনে নিলেই হবে।

হবে বলছিস?

না, হবে কেন?

ওই পয়সাগুলোয় যে সন দেওয়া আছে। তা না মিললে?

তাও তো বটে! এরকম একটা কথা যেন শীতলালক্ষ্মীও বলছিল। তবে কি আশা ছেড়ে দেবো?

তা নয়। তবে সংকটকালে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। আমরা হলুম চোর, সব গেরস্তরই ঘরের খবর জানি। আবার চোরদের গতিবিধিও নখদর্পণে। বাক্সটা প্রথমে সরলাবুড়ির বাড়ি থেকে আমিই সরাই।

তুমি! বলছো কী?

ওরে, সে এক বৃত্তান্ত। শূলপাণি যখন হাওয়া হল, তার আগের দিন সুজনবাবু আমাকে বাক্সটা সরানোর জন্য কিছু বখশিশ দেন।

এসব বলোনি তো আমাকে!

গুহ্য কথা তো, তাই বলিনি। বলা বারণ ছিল।

তারপর?

শূলপাণি হাওয়া হওয়ার পর যখন তার বাড়িতে লোকের গাদি লেগে গেল তখন আমি ঘরে ঢুকে ঘাপটি মেরে চালের ডোলের মধ্যে সেঁধিয়ে ছিলাম। লোকজন বেরিয়ে গেলে বাক্সটা হাতিয়ে নিয়ে সুজনবাবুকে দিই। তখন কি বুঝেছিলাম ওই বাক্সের এই কদর হবে?

তা সুজনবাবুর কাছ থেকে বাক্সটা ফের হাতিয়ে নিলেই তো হয়।

পাগলু দুঃখিতচিত্তে মাথা নেড়ে বলে, তবে আর সমস্যা হবে কেন? বাক্সটা তাঁর কাছ থেকে চুরি গেছে।

তাহলে?

সেই তো ভাবছি, বাক্সটা নিল কে?

বেশি ভাববার যে সময় নেই পাগলুদাদা। অনেকখানি রাস্তা। রাত আটটা নাগাদ না বেরোলে যে সকালবেলা পৌছোনো যাবে না।

পৌঁছে করবিটা কী? দিনুগুণ্ডার মামাকে খুন করবি নাকি?

না করলে যে সে-ই আমাকে খুন করবে!

ওরে দাঁড়া, দিনুর ভয়ে অমন সিটিয়ে থাকিস না। বরং চল, সুজনবাবুর কাছে যাই।

গিয়ে?

তিনি লেখাপড়া জানা বিচক্ষণ মানুষ। সাহসীও বটে। আমাকে খুবই স্নেহ করেন। যাহোক একটা বুদ্ধি তাঁর কাছে পাওয়া যাবে।

শেষমেশ তিনি আবার আমাদের কাঁচকলা দেখাবেন না তো !

না, সে ভয় নেই। আর তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে গুপ্তধন উদ্ধার হলে আধাআধি বখরা।

তাহলে চলো।

চল।

২০তম পরিচ্ছেদ

সব শুনে সুজনবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, “সাতপয়সার হাট! গগনচাঁদের হাটই সাতপয়সার হাট ! খবর ঠিক তো !"

পাগলু বলল, “যে আজ্ঞে। দিনুগুণ্ডা এদের দুজনকে বলেছে।”

“তার কথায় বিশ্বাস কী ?”

“আজ্ঞে সেটা যে দিনুর মামার বাড়ি। দিনুর মামাই হল সাতকড়ি।”

“বটে!”

“যে আজ্ঞে। তার সাতানব্বই বছর বয়স ।"

“তা হলে তো সবই মিলে গেছে দেখছি।”

“আজ্ঞে । এখন বাক্সটা নিয়েই সমস্যা ।”

“হম !"

সুজনবাবু একটু ভাবিত হলেন, ঘরের মধ্যেই কিছুক্ষণ পায়চারি করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, “বাক্সট যারা চুরি করেছে তারা যদি সাত পয়সার হাট আর সাতকড়ির সন্ধান পেয়ে যায়, তা হলেই হয়ে গেল।”

জগা হঠাৎ বলল, “অভয় দেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করব?”

“কী কথা ?”

“বাক্সটা আসলে কার?”

“জানি না, অনেকবার হাত বদল হয়ে আমার হাতে এসেছিল।”

জগা একটু গম্ভীর হয়ে বলল, “আজ্ঞে, সঠিক ওয়ারিশটাকে সেটা জানা দরকার। ”

“কেন বলো তো !”

জগা বলল, "আজ্ঞে, আমরা তো দাগি চোর, আপনারা তো তা নন। বাক্সটা নিয়ে ভদ্রলোকেরা যা করছেন তাতে বড় ঘেন্না ধরে গেল মশাই। চোরে আর ভদ্রলোকে তফাত রইল না দেখছি।"

সুজনবাবু একথা শুনে একটু হাসলেন, তারপর ঠাণ্ডা গলাতেই বললেন, "কথাটা একেবারে খারাপ বলোনি। বাক্সটা কার তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত ছিল। যতদূর শুনেছি, বাক্সটা বার-বার এর-ওর কাছ থেকে চুরি হয়েছে বা চুরি করানো হয়েছে। ওয়ারিশও এখন খুঁজে পাওয়া যাবে কি না তা বলা কঠিন।"

জগা অভিমানী গলায় বলে "খুঁজলে তো পাবেন! কেউ তো ভাল করে খোঁজই করল না।"

সুজনবাবু একটু থমকে গেলেও ভালমানুষের মতো বললেন, "কিন্তু এখন সেসব ভেবে লাভ নেই। এখন কাজ হল রহস্যটা ভেদ করা। এবং তা থেকে যদি কিছু টাকাকড়ি পাওয়া যায় তবে তা সৎ কাজে লাগানো।"

জগা ফস করে উঠল, "সৎ কাজটা কীরকম?"

সুজনবাবু এবারও একটু থতমত খেয়ে বললেন, "আমার একটা পরিকল্পনা হল—একটা ভাল গবেষণাগার তৈরি করা "

"তা গাঁয়ের লোকের কী উপকার হবে সুজনবাবু?"

"গবেষণায় সকলেরই উপকার।"

"আমরা গরিব চোর-ছাঁচোড় মানুষ। আমাদের কাছে পেটের চিন্তার বড় চিন্তা নেই। গবেষণা-টবেষণা আমরা বুঝি না। আমাদের অর্ধেক হিস্যা দেবেন বলেছেন তো!"

"হ্যা বলেছি।"

"এখন বলুন তো বাবু আমরা এই তিনজনে যদি টাকাপয়সা বা গুপ্তধন উদ্ধার করি, তা হলে আপনাকে অর্ধেক বখরা দেব কেন? আপনি কিসের হিস্যাদার?"

সুজনবাবু এবার চটলেন, ফরসা মুখখানা লাল টকটকে হয়ে গেল। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "তোমার এত বড় সাহস!"

জগা হাতজোড় করে বলল, "কিছু মনে করবেন না, এই পাগলুদাদাই আমাদের আপনার কাছে নিয়ে এসেছে, আপনি ভাল পরামর্শ দেবেন বলে, তা পরামর্শ আর কী দিলেন! শুনছি তো, কেবল বখরার কথা আর গবেষণাগার না কী যেন, বলি কাজটা কী করে উদ্ধার হবে তার কথা কিছু বলবেন? চাট্টি খেয়ে আমাদের তো রওনা হতে হবে। রাত হতে চলল, হাতে বিশেষ সময়ও নেই।"

সুজনবাবু রাগে আর উত্তেজনায় প্রথমটা কথাই বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। তারপর নিজেকে অতিকষ্টে সামলে নিয়ে পাগলুর দিকে চেয়ে

বললেন, “যদি আমাকে ডিঙিয়ে তোমরা সম্পদ উদ্ধার করে গাপ করো তা হলে তার পরিণতি ভাল হবে না।”

পাগলু কিছু বলার আগেই জগা বলল, “কেন বাবু, আপনি কি আমাদের মারবেন নাকি?”

এতক্ষণ রামপ্রসাদ কথা-টথা বলছিল না, এবার হঠাৎ বলে উঠল, “আপ ভি চোর আছেন, হামলোগ ভি চোর আছে, গুসসা করে কী হোবে? মগজমে কোই মতলব আসলে বলিয়ে ফেলুন, আপনার ভি দু-চার পইসা হোবে, হামার ভি দু-চার পইসা হোবে।”

সুজনবাবুকে খুবই চঞ্চল আর অস্থির দেখাচ্ছিল। তিনি ফের কিছুক্ষণ পায়চারি করে বললেন, “তোমরা এখন যাও। আমার ভাবতে কিছুক্ষণ সময় লাগবে। এক ঘণ্টা বাদে এসো।”

তিনজন নিঃশব্দে উঠে বেরিয়ে গেল। সুজনবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনজন অন্ধকারে কিছুদূর হেঁটে এসে একটা গাছতলায় দাঁড়াল।

জগা বলল “পগলুদাদা, সুজনবাবুর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী একটু বলবে?”

পাগলু হেসে বলল, “ওরে, উনি যে আমার মাসতুতো ভাই।”

“মাসতুতো ভাই?”

“চোরে-চোরে তো তাই সম্পর্ক।”

“তাই বলো, লোকটা কিন্তু সুবিধের নয়।”

“তা আর বলতে, লোক ভাল হলে আমাদের সঙ্গে গুজগুজ ফুসফুস করে?”

“তা লোকটা চায় কী?”

“মুফতে রোজগার করতে চায়। ভেবেছিলাম লোকটা কিছু কাজের কথা বলতে পারবে।”

হঠাৎ জগা বলল, “ওই দ্যাখ, সুজনবাবু কোথায় যাচ্ছে!”

বাস্তবিকই দেখা গেল সুজনবাবুর বাড়ির দিক থেকে একটা মোটরবাইক বেরিয়ে ঝড়ের বেগে কোথায় যেন চলে গেল।

“কোথায় যাচ্ছে বলে তো পাগলুদাদা?”

“কী করে বলব? তবে নিতাই পালের সঙ্গে সুজনবাবুর দোস্তি আছে।”

“তা হলে এখানেই চেপে বসে থাকি এসো। সুজনবাবু তো এক ঘণ্টা সময় দিয়েছে।”

“অগত্যা তাই।”

“তারা বসে-বসে নানা কথা কইতে লাগল।”

আধঘণ্টা বাদে দেখা গেল, মোটরবাইকটা ঝড়ের বেগে ফিরে আসছে। সামনে সুজনবাবু পেছনের ক্যারিয়ারের আর একটা লোক ।

বোধহয় নিতাই পালকে নিয়ে এল।

“চলো যাই পাগলুদাদা, দেখি লোকটা কী বলে।”

“চল।”

দরজায় ধাক্কা দেওয়ার বেশ কিছুক্ষণ বাদে দরজা খুললেন সুজনবাবু। গম্ভীর মুখে বললেন, “এখনও এক ঘণ্টা হয়নি। আরও পনেরো মিনিট বাকি আছে। ”

জগা একগাল হেসে বলল, “আজ্ঞে আমাদের হাতে তো ঘড়ি নেই, তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে মশাই।”

সুজনবাবু খুব কড়া চোখে তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, “ঠিক আছে, ভেতরে এসো।”

জগা ভেতরে ঢুকে বলল, “তা মশাই, আপনার মাথায় কোনও মতলব এল, নাকি বুটমুট আমাদের হয়রান করছেন?”

সুজনবাবু গিয়ে চেয়ারে বসে বললেন, “আমি চা খাচ্ছিলাম। ইচ্ছে করলে তোমরাও খেতে পারো, চা খুব স্টিমুল্যান্ট।"

“কী আন্ট বললেন?”

“বলকারক জিনিস।"

“শুধু চা? ধুর মশাই আমার যে খিদে পেয়েছে।”

“ওঃ হ্যাঁ, সন্দেশ খাবে?”

“খুব খাব মশাই, আমাদের আবার জিজ্ঞেস করতে আছে? দিলেই খাই।”

সুজনবাবু একটা সন্দেশের বাক্স ভেতরের ঘর থেকে নিয়ে এলেন, বললেন, “খাও, অনেক আছে।”

তিন জনেই টপটপ করে কয়েকটা খেয়ে নিল।

“আরও খাব মশাই?”

“খাও খাও, কোনও বাধা নেই।”

বাক্স একটু বাদেই ফাঁকা হয়ে গেল। সুজনবাবু বললেন “ওই কুঁজোয় জল আর পাশে গেলাস আছে। জলও খেতে পারো।”

তিনজনেই উঠে গিয়ে জল খেয়ে এল। জগা পেটে হাত বুলিয়ে বলল, “আহা ভুড়ি ঠাণ্ডা না থাকলে মাথাটাও ঠাণ্ডা থাকে না কিনা, আহা, এখন বড় আনন্দ

হচ্ছে।”

“হচ্ছে? বেশ বেশ !”

“তা কী ভাবলেন বলুন তো! নাকি বুদ্ধি দেওয়ার জন্য নিতাই পালকে আনতে হল?”

“নিতাই পাল ! সে কেন আসবে?”

“এসেছে মশাই, নিজের চোখে দেখেছি।”

সুজনবাবু একটু হেসে বললেন, “তোমার চোখ দেখছি বেশ শার্প।"

হাই তুলে জগা বলল, “যে আজ্ঞে । চোরের চোখ বলে কথা।”

আরও দুজনও হাই তুলল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে তিনজনের।

জগা বলল, “মশাই সন্দেশে কি সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু মেশানো ছিল?”

“কেন বলে তো!”

“এত ঘুম পাচ্ছে কেন?"

“ঘুম পেলে ঘুমোও।”

সুজনবাবু একটু হাসলেন।

তিনজনের ঘুমন্ত মাথা পর্যায়ক্রমে ঠাই ঠাই করে টেবিলে পড়ল হঠাৎ।

২১তম পরিচ্ছেদ

ঘরের বাইরে পেছনের আগাছার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে জানালার পাল্লার একটু ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরকার দৃশ্যটা দেখছিল আর-একজন। সুজনবাবু তিনটে চোরকে সন্দেশ খাওয়ালেন এবং তারপরই তিনজন প্রায় একই সঙ্গে সংজ্ঞা হারিয়ে টেবিলে মাথা দিয়ে পড়ে রইল।

সুজনবাবু পেছনে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত তিনজনের দিকে চেয়ে পরিতৃপ্তির হাসি হাসলেন, তারপর অনুচ্চ গলায় ডাকলেন, “নিতাই!”

ভেতরের ঘর থেকে নিতাই বেরিয়ে এল। চোখমুখে কিছুটা যেন আতঙ্কের ভাব, "সুজনবাবু, এরা মরে যায়নি তো!”

“আরে না, মরবে কেন? ঘণ্টা কয়েকের জন্য অজ্ঞান হয়ে গেছে মাত্র।”

“বাঁচা গেল।”

“বড্ড জ্বালাচ্ছিল। চোর বটে, কিন্তু বুদ্ধিমান চোর নয়। কাজ পণ্ড করে দিত।”

“কিন্তু কাজটাই বা কী করে হবে? সেই কড়ি আর পয়সা তো চুরি হয়ে গেছে।”

গম্ভীর হয়ে সুজনবাবু বললেন, “হুম, সেটাই ভাবিয়ে তুলল।”

“চোরদের তো আপনি দেখেছেন। চেনা ঠেকেনি?”

“না হে! আচমকা মাথায় মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল।”

“এরা কি এভাবেই পড়ে থাকবে?”

“না, জ্ঞান ফিরলে গোলমাল করতে পারে। আমার ঘরে এভাবে এদের পড়ে থাকাটাও ভাল দেখাবে না।”

“তা হলে?”

“একটু পরিশ্রম করতে হবে।”

“তিনজনকে অন্য কোথাও পাচার করবেন?”

“ঠিক ধরেছ, তবে বেশি দূরে নয়। রাস্তার ওপাশে একটা জংলা জায়গা আছে। ধরাধরি করে সেখানে নিয়ে গিয়ে রেখে আসতে হবে।”

“কিন্তু তাতে কি প্রতিক্রিয়া এড়াতে পারবেন?”

“সে পরে দেখা যাবে। ”

“এরা জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর আপনার ওপর প্রতিশোধ নেবে না তো!”

“তত এলেম এদের নেই। অন্তত পাগলু সেরকম নয়। তবে ওই জগাটা একটু ট্যাটা আছে। আর রামপ্রসাদ এ-গাঁয়ের লোক নয়। কাজেই ওকে নিয়ে চিন্তা নেই।”

“তা হলে চলুন, কাজটা সেরেই ফেলা যাক। দেরি করলে কে কখন এসে পড়বে।”

এরপর দুজন ধরাধরি করে একে-একে তিনজনকে নিয়ে আগাছার জঙ্গলে ফেলে এল। তারপর দু’জনে মুখোমুখি বসল।

নিতাই বলল, “এরপর প্ল্যানটা কী?”

“এটা তো জানা গেছে যে, গগনচাঁদের হাটই সাতপয়সার হাট। আর সাতকড়ি নামে একশো বছরের কাছাকাছি বয়সি একটা লোকও সেখানে থাকে। সুতরাং আমাদের কাজ অনেকটাই এগিয়ে গেছে।”

“কাজ কোনদিকে এগোল তা তো বুঝতে পারছি না।”

“কেন বলো তো !”

“গোটাটাই তো অন্ধকারে ঢ়িল ছোঁড়া।”

সুজনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, “হয়তো তাই। কিন্তু কে বলতে পারে?”

“সুজনবাবু, সামান্য একটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে শূলপাণিকে সরিয়ে ফেলা বা পরঞ্জয়বাবুকে অন্যত্র নিয়ে রাখাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যায়নি কি?”

সুজন থমথমে মুখে বলে, “তুমি জানো না, শূলপাণির মুখচোখ দেখে আমার মনে হয়েছিল, সেই ওই বাক্সের রহস্য প্রায় ভেদ করে ফেলেছে। পাগল ছাগল যাই হোক, শূলপাণিকে ছেড়ে রাখা বিপজ্জনক ছিল, আর পরঞ্জয় শূলপাণির সঙ্গে মাখামাখি শুরু করায় ব্যাপারটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়।”

“বিপদ এখনও আছে। শূলপাণি ছাড়া পেয়ে গাঁয়ের লোককে ঘটনাটা বললে কী হবে কে জানে!”

“ভয়ের কিছু নেই। শূলপাণিকে গুম করেছে বাইরের ভাড়াটে লোক। আমরা যে তার পেছনে আছি, তা তো সে জানে না।”

“আপনাকে ধরা যাবে না ঠিকই, কিন্তু আমাকে তো শূলপাণি দেখেছে।”

“তোমারও ভয় নেই, তুমি অন্য গাঁয়ে থাকো, তোমাকে কেউ কিছু করবে না। তা ছাড়া শূলপাণিকে তো আমরা খারাপ রাখিনি। সে খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, আরামে আছে। শুধু ঘরে তালা দিয়ে রাখা হয় এই যা।”

“পরঞ্জয়বাবু কি কিছু সন্দেহ করবেন না?”

“পরঞ্জয়বাবুর কেসটা আলাদা, তাঁর সংসারে শান্তি ছিল না বলে তাঁকে আমি অজ্ঞাতবাসের পরামর্শ দিই। তিনি তো খুশি মনেই প্রস্তাবটা মেনে নিয়েছেন। আছেনও ভাল। জঙ্গলের মধ্যে ক্যাম্প করে দিব্যি শিকার করছেন, নিজেই রান্না করে খাচ্ছেন। দেখাশোনা করার জন্য লোকও রাখা হয়েছে একজন।”

নিতাই বলল, “হ্যাঁ, এদের পেছনে আপনার টাকা আর পরিশ্রম বড় কম যায়নি। কিন্তু শেষ অবধি কী লাভ হবে সেটাই ভাববার বিষয়।”

“দ্যাখ নিতাই, জীবনটা এরকমই, সবসময়ে লাভ হবে এমন কথা নেই, ঝুঁকি নিতেই হয়। টাকা খরচ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু যদি আন্দাজটা লেগে যায় তা হলে এই খরচটা সুদে-আসলে উশুল হয়ে যাবে।"

“কিন্তু সুজনবাবু, এখন প্রশ্ন হল, ওই সাতটা পয়সা আর সাতটা কড়ি ছাড়া শেষ রক্ষা হবে কি না।"

“দেখা যাক। আজ রাতেই আমাদের রওনা হতে হবে। কাল ভোরেই আমাদের কাজ।”

“ঠিক আছে। আমি তৈরি।"

জানালার বাইরে ঘাপটি মেরে থাকা ছায়ামূর্তির পাশে হঠাৎ আর একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল।

প্রথম ছায়ামূর্তি দ্বিতীয়জনের দিকে চেয়ে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ থাকতে ইশারা করল।

ভেতরে সুজনবাবু তাঁর রিভলভারে গুলি ভরলেন, একখানা বাঁদুরে টুপিতে মুখমাথা প্রায় ঢেকে ফেললেন, হাতে দস্তানা গলালেন।

নিতাই পালও সোয়েটার পরল।

"তা হলে দুর্গা' বলে বেরিয়ে পড়া যাক সুজনবাবু।"

"হ্যাঁ চলো।"

দুজনে বাতি নিভিয়ে দিয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রথম ছায়ামূর্তি দ্বিতীয়জনের দিকে চেয়ে বলল, "কিছু বুঝলে?

"আন্দাজ করছি।"

"নাটের গুরু হচ্ছে ওই সুজনবাবু।"

দ্বিতীয় ছায়ামূর্তি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "সে সন্দেহও ছিল।"

পবনকুমার মৃদু স্বরে বলল, "তোমার বাড়ি থেকে কাঠের বাক্সটা কবে চুরি যায়?"

"অনেকদিন আগে "

"বাক্সের রহস্য কিছু জানো?"

"খুব পরিস্কারভাবে জানি না, তবে পিতামহের আমলের কোনও ঘটনা। মনে হয় কোনও একজন বিশেষ খাতকের কাছে আমাদের প্রভূত পরিমাণ পাওনা আছে। দাদু কোনও কারণে সরাসরি পাওনাগণ্ডার দলিল না করে এরকম একটা অদ্ভুত সাঙ্কেতিক ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন । হয়তো রহস্য ভালবাসতেন বলেই। "

"তার মানে বাক্স যে পাবে এবং রহস্য যে ভেদ করতে পারবে পাওনাগণ্ডা সে-ই আদায় করতে পারবে?"

"হ্যাঁ।"

"আর না পারলে পাওনাগণ্ডা খাতকের দখলেই থেকে যাবে?"

"হ্যাঁ"

"ভাল চাল দেখছি।"

"হ্যাঁ।

আমার দাদু এসব ছোটখাটো রহস্য করতে ভালবাসতেন।"

"তার মানে তুমি ন্যায্য অধিকারী হয়েও পাওনাগণ্ডা আদায় করতে পারবে না?"

“তাই তো দাঁড়াচ্ছে।”

পবনকুমার একটু ভেবে বলল, “সুজনবাবু যদিও রহস্য ভেদ করতে পেরেছেন কিন্তু বাক্সটা ওঁর কাছে নেই। সুতরাং উনি সুবিধে করতে পারবেন না।”

“না।”

“কিন্তু সঙ্গে রিভলভার নিয়েছেন, খুন-খারাপ করবেন না তো!”

“লোকটাকে আমি সামান্যই চিনি। কীভাবে বলব ?”

“উনি একটু গুণ্ডাপ্রকৃতির মানুষ। বয়স হওয়ায় গায়ের জোর কমলেও বুদ্ধি দিয়ে গুণ্ডামি করতে ছাড়েন না।”

“তাই তো দেখছি।”

পবনকুমার ভ্রু কুঁচকে একটু ভেবে নিয়ে বলল, “তোমাদের এখন পড়তি অবস্থা। পাওনাগণ্ডা আদায় হলে তোমার সুবিধে হত।”

“হ্যাঁ। প্রজাপালক হিসেবে এ-বংশের নাম ছিল, তুমি তো জানো। কিছু টাকা-পয়সা হাতে এলে সেই কাজটা করা যেত।”

“জানি, কিন্তু সুজনবাবুর সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত। লোকটা মরিয়া হয়ে নেমেছে। শূলপাণি আর পরঞ্জয়বাবুকে গুম করার মতো কাজ যে করতে পারে সে সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়।”

“বুঝেছি।”

“কিন্তু আমাদের একটা ভরসা আছে। বাক্সটা এখনও সুজনের হাতে নেই।”

“বাক্সটা কার কাছে আছে পবন?”

“সেটা জানলে তো কাজ হয়েই যেত।”

মহেন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “আমি আশা ছেড়েই দিয়েছি।”

“তা কেন ছাড়বে? ঠাণ্ডা মাথায় এসো দুজনেই একটু ভাবি ।”

“তা ভাবা যেতে পারে। কিন্তু ঘটনা যেমন দ্রুত এগোচ্ছে তাতে—”

“আরে, অত ভেঙে পোড়ো না । দেখাই যাক না।

২২তম পরিচ্ছেদ

পবনকুমার আর মহেন্দ্র যখন স্থানত্যাগ করার উপক্রম করছে তখন হঠাৎ একটা শব্দ পেয়ে দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়ল। শব্দটা বেশ জোরালোই, কে যেন সুজনের দরজার তালা ভাঙার চেষ্টা করছে।

ঝনাৎ-ঝনাৎ করে বারতিনেক শব্দ হল। তারপরই ঝড়াক করে দরজাটা খুলে ঘরে ঢুকল একটি অন্ধকার মানুষ।অন্ধকার বলে তাকে দেখা গেল না ঠিকই, কিন্তু পবনকুমারের অভ্যস্ত চোখ দেখতে পেল লোকটা বেশ লম্বা-চওড়া।

একটা টর্চ জেলে লোকটা চারদিকটা দেখতে লাগল। জিনিসপত্রও হাঁটকাল, বিশেষ করে টেবিলের ওপর কাগজপত্রগুলো, ডুয়ার খুলে সব তছনছ করল কিছুক্ষণ।

পবনকুমার চাপা গলায় মহেন্দ্রকে বলল, "পরঞ্জয়বাবু।"

"অ্যাঁ! বলো কী !"

"চুপ।"

মহেন্দ্র চাপা গলায় বলল, "কী করছেন উনি ?"

"কী খুঁজছেন?"

"তা কী করে বলব ?"

"চলো ওঁকে ধরি।"

"ধরবে ?"

"ক্ষতি কী ?"

"অপ্রস্তুত হবেন হয়তো।"

"তা হোক না, আমাদেরও তো উনি অপ্রস্তুত কিছু কম করেননি।"

"তাহলে চলো ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। বেরোলে মুখোমুখি হওয়া যাবে।"

"তাই চলো ।"

দুজনে গিয়ে ফটকের দুধারে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিনিট পনরো বাদে পরঞ্জয় টর্চ নিবিয়ে বেরিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর ভাবতে-ভাবতেই এগিয়ে এলেন ফটকের দিকে।

পবনকুমার মৃদুস্বরে বললেন, "এই যে পরঞ্জয়বাবু!"

পরঞ্জয় এমন চমকে উঠলেন যে, বলার নয়। ধী করে একটা পিস্তল বের করে প্রায় ট্রিগার টিপে দিয়েছিলেন, আর কি। কিন্তু মহেন্দ্র তার চেয়েও দ্রুতবেগে পরঞ্জয়ের কবজি চেপে ধরে পিস্তলের লকটা নামিয়ে দিয়ে বললেন, "করছেন কী?"

পরঞ্জয় অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, "আরে তোমরা ! তোমরা এখানে কী করছ?"

পবন বলল, “সেই প্রশ্ন তো আমাদেরও, আপনি এখানে কী করছেন?”

পরঞ্জয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “কী করছি তা এক কথায় বলা মুশকিল। বলতে সময় লাগবে।"

“তার আগে বলুন, হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলেন কেন।”

“নিজের ইচ্ছায় হইনি।”

“তবে কি সুজনবাবুর ইচ্ছেয় ?”

“অনেকটা তাই, তিনি আমাকে একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন, আমি সেটা গ্রহণ করেছি মাত্র।”

“এখন বাকি কথা বলুন।”

“এখানে দাঁড়িয়ে?”

“তার দরকার কী ? আমরা সুজনবাবুর ঘরে গিয়েও বসতে পারি। উনি আজ রাতে আর ফিরবেন না।”

“ফিরবেন না? কেন কোথায় গেছেন সুজনবাবু?”

“গুপ্তধনের সন্ধানে।”

“সর্বনাশ! তা হলে তো—”

“ব্যস্ত হবেন না পরঞ্জয়বাবু। গুপ্তধন উদ্ধার করা অত সহজ নয়, কিন্তু আপনিই বা কেন গুপ্তধন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন?”

পরঞ্জয় একটু থতমত খেয়ে বললেন, “আসলে কী জানো, রহস্য ভেদ করতে আমি বড় ভালবাসি।”

পবনকুমার বললেন, “রহস্যভেদ করা ভাল, কিন্তু আগে জানা দরকার গুপ্তধন বলে যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা আসলে কার প্রাপ্য। আপনি কি তা জানেন?”

“না, কার প্রাপ্য তোমরা জানো?”

“জানি। ওই বাক্সটা মহেন্দ্রর হেফাজত থেকে অনেকদিন আগে চুরি যায়।”

“বলো কী !”

“হ্যাঁ। ওই গুপ্তধনের আসল উত্তরাধিকারী মহেন্দ্র। ওর পিতামহ কিছু বিষয়সম্পত্তি বা টাকাপয়সা যাই হোক একজনের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। কী শর্তে তা অবশ্য আমাদের জানা নেই, সেটা উদ্ধার করা যাবে কি না তাও জানি না। কিন্তু উদ্ধার হলে তা মহেন্দ্ররই প্রাপ্য হয়।”

পরঞ্জয় যেন একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপর বললেন, "ওহে বাপু, অতশত আমার জানা ছিল না। আমি শূলপাণির কাছে শুনেছিলাম যে, ওই বাক্সে যা আছে তা এলেবেলে জিনিস নয়, একটা সংকেত আছে।"

"তাই কি দুজনে ষড়যন্ত্র করছিলেন?"

"ষড়যন্ত্র ! ষড়যন্ত্র হবে কেন?

আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি, সঙ্কেত উদ্ধারের চেষ্টা করতাম, যেমন লোকে ধাঁধাঁর সমাধান করে বা শব্দজব্দ মেলায়।

"গুপ্তধন যদি উদ্ধার হত তা হলে কী করতেন?"

"সত্যি কথা বলব?"

"বলুন না।" "আমার ইচ্ছে ছিল কিছু মোটা টাকা পেলে মধ্যপ্রদেশে গিয়ে অনেকটা জমি বন্দোবস্ত করে নিয়ে একটা জঙ্গল বানাতাম।"

"জঙ্গল?"

"হ্যাঁ । এ-দেশের বনজঙ্গল যেভাবে সাফ হয়ে যাচ্ছে, তাতে মনটা বড় খারাপ হয়।"

পবন আর মহেন্দ্র দুজনেই হাসল। পরঞ্জয় বললেন, "জঙ্গল বানিয়ে বাঘ টাঘ ছাড়তাম।"

"তারপর বাঘগুলোকে শিকার করতেন তো!"

"আরে না, শিকারের শখ যৌবনে ছিল, এখন অরণ্যের জীবদের জন্যে কষ্ট হয়। যাকগে, গুপ্তধন যখন মহেন্দ্রর তখন আর ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই।"

"কিন্তু আপনি অজ্ঞাতবাস ছেড়ে ফিরছেন কবে?"

"সংসার আর ভাল লাগে না। জঙ্গলে তো বেশ আছি, তাঁবুতে থাকি, সারাদিন ঘুরি, পাখির ডাক শুনি। বেশ কেটে যাচ্ছে, তোমরা আমাকে এরকমই থাকতে দাও।"

"তাই নয় থাকবেন।"

"এতদিন সুজন আমাকে পুষতেন, তাঁরই খরচে আছি, এবার থেকে না হয় নিজের খরচেই থাকব।"

"আমাদের জানা দরকার সুজন আপনাকে পুষতেন কেন?"

"সেটা প্রথমে বুঝতে পারিনি, ভেবেছি আমার প্রতি তাঁর একটা সিমপ্যাথি হয়েছে বলেই বুঝি প্রস্তাবটা দিয়েছেন, কিন্তু পরে বুঝতে পারি আমাকে ঘটনা থেকে দূরে রাখার জন্যেই এটা একটা চালাকি।"

"তাই ওঁর ঘরে আজ হানা দিয়েছিলেন?"

“অনেকটা তাই, আমি দেখতে এসেছিলাম বাক্সের সঙ্কেত ভেদ করে উনি কী পেয়েছেন।"

“তালা ভাঙলেন কেন?”

“সুজন নেই দেখে মাথায় বদ মতলব খেলে গেল। ভাবলাম সঙ্কেত ভেদ করে কোথাও কিছু লিখে রেখেছে কি না।”

“কিছু পেলেন?”

“না”

“সঙ্কেত ভেদ করেও লাভ নেই, বাক্সটা কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। ওটা সুজনের হেফাজত থেকে চুরি গেছে।”

পরঞ্জয় একটু হেসে বললেন, "চুরি আমিই করিয়েছি।”

“বলেন কী ?”

“হ্যাঁ।”

জঙ্গলে যারা কাঠ বা পাতা আনতে যায় তাদের সঙ্গে আমার খুব ভাব। তাদের দিয়েই কাজটা করিয়েছি।”

“তা হলে কি বাক্সটা আপনার কাছে?”

“অবশ্যই, ওটা আমি মোটা প্লাস্টিকে জড়িয়ে মাটিতে পুঁতে রেখেছি।”

“সেটাই যে এখন দরকার ”

“তা হলে চলো, বের করে দিচ্ছি।

ওয়ারিশান যখন পাওয়া গেছে তখন ও বস্তু রেখে আমার লাভ কী? মহেন্দ্র কিছু মনে কোরো না, আগে জানলে আমি লোভ করতাম না।”

মহেন্দ্র বললেন, “আমি কিছু মনে করিনি, তবে এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য পেলে খুশি হব।”

“নিশ্চয়ই, সুজনবাবু লোকটি খুব সুবিধের নন। যদিও খুবই উচ্চশিক্ষিত বলে শুনি, কিন্তু মতলবটা মোটেই ভাল নয়। চলো, একটু তাড়াতাড়ি যাই, নইলে অঘটন ঘটতে পারে।”

পবনকুমার বললেন, “হা, সেইটেই ভয়, সুজনবাবু পিস্তল নিয়ে গেছেন।”

তিনজনে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে হাঁটা দিলেন।

২৩তম পরিচ্ছেদ

পরঞ্জয়, পবনকুমার আর মহেন্দ্রর রওনা হতে একটু দেরি হল, কারণ পরঞ্জয়ের জঙ্গলের আস্তানা অনেকটা দূর।পায়ে-হাঁটা পথ নয়। পরঞ্জয় একটা ঘোড়ায় চেপে এসেছেন, আরও দুটো ঘোড়া রাজবাড়ির আস্তাবল থেকে জোগাড় করতে হল, কপাল ভালই, আস্তাবলে রাজবাড়ির শেষ দুটো ঘোড়াই অবশিষ্ট আছে। মহেন্দ্র মাঝে-মাঝে চড়েন।

গোটাপাঁচেক গ্রাম পেরিয়ে প্রায় বারো মাইল দূরবতী জঙ্গলে পৌঁছতে বেশ সময় লেগে গেল।

জঙ্গলের পথে ঢোকার মুখে পরঞ্জয় হুঁশিয়ার করে দিলেন, "ওহে, এরাস্তা খুব অন্ধকার, মাথার ওপর মোটা ডাল, লতাপাতা আছে। মাথা নিচু করে আস্তে-আস্তে এসো। "

"জঙ্গলটা বাস্তবিকই বেশ ঘন আর জম্পেশ।"

পবনকুমার বললেন, "একসময়ে এসব জঙ্গলে আমার আস্তানা ছিল। সব চিনি। "

পরঞ্জয় বললেন, "তা বটে। তুমি যে একসময়ে রাজদ্রোহী ছিলে তা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"ডাকাতিও করতে হত। সে একটা দিনই গেছে।"

আগু-পিছু তিনজন সাবধানে ঘোড়া চালাতে লাগলেন। পরঞ্জয়ের বেশ শক্তিশালী টর্চবাতি থাকায় তেমন অসুবিধে হল না।

জঙ্গলের মধ্যে মাইলখানেক এগনোর পর পরঞ্জয়ের তাঁবু দেখা গেল। মিলিটারির ধরনের খাঁকি রঙের মজবুত তাঁবু। তলায় মাটি চেছে লেপেপুছে বেশ তকতকে করা হয়েছে, ডবল তাঁবুর ভেতরে ক্যাম্পখাট আর বসবাস করার জন্য অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র রয়েছে।

"মহেন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন, "এভাবে কষ্ট করে থাকেন বুঝি?"

"কষ্ট! কষ্ট কিসের? চিরকাল বনজঙ্গল ভালবাসি। এখানে থাকলে মনটা পবিত্র থাকে। খুব ভাল আছি হে।"

কিন্তু বিপদআপদ! সাপখোপ বা পোকামাকড়ের উৎপাতও তো আছে।"

"তা আছে। খুবই আছে। কিন্তু জঙ্গলে বসত করলে ধীরে ধীরে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তৈরি হয়ে যায়। তাঁবুতে যদি সাপ ঢোকে তবে গভীর ঘুমের মধ্যেও আমি ঠিক টের পাব।"

"পেয়ে কী করবেন? সাপটকে মারবেন?"

"পাগ ! অন্ধকারে, ঘুমচোখে সাপ মারার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল। তখন নড়াচড়া বন্ধ করে চুপটি করে শুয়ে থাকব। সাপ গা বেয়ে উঠলেও

অকারণে কামড়াবে না।”

“আপনার সাহস আছে।”

“সাহস বলো সাহস, কৌশল বলো কৌশল ।”

“জিনিসপত্র এভাবে ফেলে রেখে যান, চুরি হয় না ?”

“না হে, পাহারাদার আছে।"

“কোথায় পাহারাদার? কাউকে তো দেখছি না!"

“দেখবে?” বলে হেসে পরঞ্জয় হঠাৎ হাঁক মারলেন, “টুপসা ।”

ডাকার সঙ্গে-সঙ্গেই একজন বেঁটেখাটো মাঝবয়সী লোকের আবির্ভাব ঘটল তাঁবুর দরজায়। লম্ফের ম্লান আলোয় যতদূর বোঝা গেল যে আদিবাসী মানুষ।

পরঞ্জয় বললেন, “আমি সঙ্গে আছি দেখে সামনে আসেনি। নইলে এতক্ষণে তোমাদের ওপর চড়াও হত।"

“এ কি আপনার কাছেই থাকে?”

“না। জঙ্গলের পাশেই ওদের গ্রাম। খোঁজখবর নেয়, নজরে রাখে, এই পর্যন্ত। আমিও ওদের দায়ে দফায় দেখি, অসুখ হলে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিই।”

পরঞ্জয় একটা পেট্রোম্যাক্স জ্বাললেন, তারপর একটা শাবল বের করে বললেন, “চলো, আগে বাক্সটা তুলি।”

টুপকা পেট্রোম্যাক্সটা নিয়ে আগে-আগে চলল। তাঁবুর পেছন দিকে একটা বড় অশ্বত্থ গাছের তলায় পরঞ্জয় শাবল চালিয়ে গর্ত খুঁড়লেন। তারপর বাক্সটা বের করে মহেন্দ্রর হাতে দিয়ে বললো, “খুলে দেখে নাও, কড়ি আর পয়সা আছে কি না ।”

মহেন্দ্র বাক্স খুলে দেখলেন, সবই ঠিক আছে। সবাইফের তাঁবুতে ফিরে এলেন। পরঞ্জয় বললেন, “সাতপয়সার হাটে যাওয়ার অর্ধেক পথ আমরা চলেই এসেছি। আরও দশ-বারো মাইল পথ, রওনা হওয়ার আগে একটু কফি খেয়ে নিই এসো, জঙ্গলে তোমাদের আর কী আপ্যায়ন করতে পারি বলো। "

মহেন্দ্র বললেন, “আপ্যায়নের দরকার নেই, কফি হলেই চলবে।”

পরঞ্জয় বললেন, “সঙ্গে বন্দুক-পিস্তল নিতে হবে নাকি?”

পবনকুমার বললেন, “একটা পিস্তল সঙ্গে থাক। তবে মনে হয় না ওসবের দরকার হবে। ভয় দেখানোর জন্য কাজে লাগতে পারে।”

আরও আধঘণ্টা বাদে তিনজন ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে পড়লেন।

মহেন্দ্র পরঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করলেন, “শূলপাণি এখন কোথায় তা কি জানেন?”

“না। শূলপাণিকেও কোথাও সরিয়ে রাখা হয়েছে।”

“কেন বলুন তো!"

“শূলপাণিকে তোমরা পাগল বলে জানো। পাগল না হলেও তার মাথায় ছিট আছে। কিন্তু বুদ্ধি বা মেধা তার বড় কম নেই। সে বুঝেছিল, এই বাক্সটা একটা রহস্যময় জিনিস।”

“বাক্সটা আমাদের বাড়ি থেকে চুরি যায়।”

“সেটা আমার জানা ছিল না।”

“আমি ভাবছি, বাক্সটার কথা সরলাবুড়ি কি করে জানল। আর চুরিই বা করাল কেন?"

সরলাবুড়ি যে রাজবাড়ি থেকেই ওটা চুরি করিয়েছিল এমন নাও হতে পারে। হয়তো তোমাদের বাড়ি থেকে চুরি যাওয়ার পর সরলাবুড়ি ওটার সন্ধান পায় এবং চোরের ওপর বাটপাড়ি করায়।”

“হ্যাঁ, সবই সম্ভব। তবে বাক্সটার কথা জানা থাকলেও ওটা যে একটা সঙ্কেত, তা আমার জানা ছিল না, খুব সম্প্রতি আমার দাদুর কিন্তু পুরনো হাতের লেখা কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে বাক্সটার ব্যাপারে জানতে পারি। ততদিনে অবশ্য বাক্স চুরি হয়ে গিয়েছিল।”

পবনকুমার বললেন, “পরঞ্জয়বাবু, কিছু টাকা-পয়সা পাওয়া গেলে মহেন্দ্র মানুষের কাজে তা খরচ করবে।”

“খুব ভাল।”

মাঝরাত পেরিয়ে তাঁরা সাতপয়সার হাট নামে গাঁয়ে পৌঁছলেন। গ্রাম নিঃকুম। শুধু কয়েকটা কুকুর তাঁদের দেখে ঘেউ-ঘেউ করতে লাগল।

পরঞ্জয় বললেন, “সাতকড়ির বাড়িটা কোন দিকে?”

পবনকুমার বললেন, “গাঁয়ের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য বাড়িটাই তার হওয়ার কথা, চলুন, একটু ঘুরে দেখি।”

বেশি খুঁজতে হল না। গাঁয়ের এক প্রান্তে বেশ বড় পাঁচলঘেরা একটা দোতলা বাড়ি দেখা গেল। ফটকে মোটা তালা ঝুলছে। ফটকের ভেতরে দারোয়ানের ঘরে দারোয়ানও আছে বলে মনে হল। তবে সে হয়তো ঘুমোচ্ছে।

পরঞ্জয় বললেন, “এবার ?”

মহেন্দ্র বললেন, “আমাদের একটু আড়ালে অপেক্ষা করতে হবে।”

“আড়ালে কেন ?”

“কারণ, সুজনবাবু এবং নিতাই পালও এখন এ-গাঁয়ে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে। তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি হওয়াটা আমি এড়াতে চাই।”

“তা বটে ”

পবনকুমার বললেন, "চণ্ডীমণ্ডপটা পেরিয়ে এলাম। চলুন, সেখানেই ফিরে গিয়ে রাতটা কাটিয়ে দিই। সকাল হোক তারপর দেখা যাবে।”

“সেটাই ভাল ”

চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁকা হাঁ-হাঁ করছে। বাঁধানো চাতালে তিনজন বসে জিরোতে লাগলেন। ঘোড়াগুলো ছাড়া পেয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোতে লাগল।

পরঞ্জয় হঠাৎ বললেন, “আচ্ছা, ওরা তো সোজা পথে গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবে না। যদি ওরা আজ রাতেই ও-বাড়িতে ঢুকে হামলা করে?”

পবনকুমার সোজা হয়ে বসে বললেন, “তাই তো?”

২৪তম পরিচ্ছেদ

তিনজনেই ফের উঠে পড়লেন ।

পরঞ্জয় বললেন, বিশ্রাম নিয়ে ভাববেন না। আমরা বরং সাতকড়ির বাড়ির ধারে কাছে থানা গেড়ে থাকি।

পবনকুমার বললেন, সেইটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

মহেন্দ্র বলে উঠলেন, কিন্তু সুজনবাবু যে রকম মরিয়া হয়ে উঠেছেন তাতে গুলিটুলি চালিয়ে দেবেন না তো !

পরঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বললেন, অসম্ভব নয়। আমি যতদূর জানি সুজনবাবু একটা ল্যাবরেটরি বানানোর চেষ্টা করছেন। বিজ্ঞানের গবেষণাগার তৈরি করতে অনেক টাকা লাগে। সেই টাকার জন্যই উনি হন্যে হয়ে উঠেছেন।

পবনকুমার বললেন, কিসের ল্যাবরেটরি তা জানেন? বিজ্ঞানের তো অনেক শাখা।

পরঞ্জয় বললেন, উনি সেটা আমাকে ভেঙে বলেননি। আমেরিকায় উনি কী করতেন তাও কখনও আলোচনা করেননি।

মহেন্দ্র বললেন, “যতদূর মনে হয় ওঁর বিষয় হল পদার্থবিদ্যা। উনি একজন পণ্ডিত ও গুণী মানুষ। তবু এই বেআইনি কাজটি কেন করতে যাচ্ছেন সেটাই বুঝতে পারছি না।”

পবনকুমার বললেন, এ গাঁয়ের অপরাধীদের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ আছে। সেটাও খুব ভাল ব্যাপার নয়।

মহেন্দ্র বললেন, গন্ধটা থেকেই যাচ্ছে।

তিনজন হাঁটতে হাঁটতে সাতকড়ির বাড়ির ফটকের কাছে পৌঁছে গেলেন।

পরঞ্জয় বললেন, বাড়ির কম্পাউন্ডটা বিশাল বড়। তবু একটা চক্কর সেরে আসবে নাকি হে?

পবন বললেন, সেটা মন্দ প্রস্তাব নয়। সাতকড়ির বাড়ির চারদিকে দশ ফুট উঁচু দেয়াল। দেয়ালের ওপরে কাঁচ বসানো। তবু দেয়ালটা ডিঙোনো খুব একটা শক্ত কাজ নয়। কারণ, বাড়ির উত্তর আর পশ্চিমে দেয়ালের বাইরেই বিশাল আমবাগান। সেই আম বাগানের মেলা গাছের ডাল সাতকড়ির দেয়াল ডিঙিয়ে ভেতরে ঝুলে পড়েছে। গাছের ডাল বেয়ে দিব্যি ঢোকা যায়।

পরঞ্জয় সেই কথাটাই বললেন, চারদিকে দেয়াল থাকলে কী হবে, চোরের পক্ষে কোনও সমস্যাই নয়।

পবনকুমার বললেন, চোরেরা পারলেও সুজনবাবুর পক্ষে পারা মুশকিল। তাঁর বয়স সত্তরের ওপর।

পরঞ্জয় বললেন, আমার বয়সও সত্তরের কাছাকাছি। আমি জঙ্গলে যে ভাবে বাস করি তোমরা পারবে না। বয়সটা ফ্যাকটর নয়। আসল কথা হল প্র্যাকটিস। সুজনবাবু বেশ চটপটে এবং শক্তিমান মানুষ।

মহেন্দ্র বললেন, হ্যা, তা বটে।

পরঞ্জয় বললেন, সত্তর বছর বয়সেও সুজন ব্যায়াম করেন। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়া আর পরিশ্রমের ফলে সুজন বেশ ফিট। কিন্তু এই বয়সে বেশি আকাঙ্ক্ষা করাটা ঠিক নয ! ওঁর উচ্চাশা বড্ড বেশি।

তাঁরা হাঁটছেন আগাছা এবং ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। নিকস্যি অন্ধকার চারদিকে। পরঞ্জয় মাঝে মাঝে টর্চ জেলে পথ দেখে নিচ্ছেন। তাঁর পেছনে পবন এবং মহেন্দ্র।

পবন কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পরঞ্জয় থমকে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বললেন, চুপ।

টর্চটা নিবিয়ে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলো পরঞ্জয়। তারপর খুব চাপা গলায় বললেন, হুঁশিয়ার।

পবন বললেন, কী হল?

সামথিং ইজ হ্যাপেনিং অ্যাহেড। শব্দ না করে এসো।

একটু থেমে তিনজন আবার সাবধানে এগোতে লাগলেন। দশ-বারো গজ এগিয়ে পরঞ্জয় আবার দাঁড়ালেন। টর্চটা জেলে চারদিকটা খুঁটিয়ে দেখে বললেন, এখান দিয়েই ঢুকেছে।

পবন বললেন, একটু বুঝিয়ে বলুন। সামনে একটা আমগাছের গায়ে টর্চ ফেলে পরঞ্জয় বললেন, এ গাছটায় ওঠা সবচেয়ে সহজ একখানা ডাল কেমন বাঁকা হয়ে উঠে গেছে দেখেছ? এই ডাল বেয়ে যে-কেউ দেয়াল পেরোতে পারে।

কেউ দেয়াল পেরিয়েছে বলে মনে হচ্ছে কেন আপনার?

আমি জঙ্গলে থাকি তো তাই আমার কান খুব সজাগ। সামান্য ডালপালা নাড়া বা পাতা খসে পড়ার শব্দও টের পাই। কেউ যে এই গাছ বেয়েই ভেতরে ঢুকেছে তাতে সন্দেহ নেই।

পরঞ্জয়বাবু টর্চ জেলে দুজনকে দেখালেন, গাছের তলায় ঝোপঝাড়ে কিছু দলিত মথিত ভাব। আর হেলানো ডালটার গা থেকেও একটু বাকল খসার চিহ্ন।

পবন বললেন, তাহলে আমরা এখন কী করব?

পরঞ্জয় দৃঢ়স্বরে বললেন, আমাদেরও মহাজনপন্থা নিতে হবে।

সর্বনাশ! বুড়োবয়সে পড়েটড়ে যে হাড় ভাঙবে। প্রাণও যেতে পারে।

তুমি না বিপ্লবী ছিলে! ছোঃ, প্রাণের ভয় আবার একটা ভয় নাকি? আর বয়সের কথা তুললে বলতেই হয় যে, তোমরা আমার হাঁটুর বয়সী। বুড়ো হওয়ার আগেই বুড়িয়ে গেলে চলবে কেন ?

আচ্ছা ঢুকে হবেটা কী?

তা জানি না। আমার মন বলছে আমাদের ভেতরে যাওয়া একান্ত দরকার।

আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না। সবসময় আপনি অ্যাডভেঞ্চার খোঁজেন। কী আর করা যাবে। চলো হে মহেন্দ্র।

গাছে উঠতে খুব যে একটা অসুবিধে হল, তা নয়। তবে অন্ধকার বলে একটু সময় লাগছিল। তবে ডালটা বড় চমৎকার। দেয়াল পেরিয়ে একটা প্যারাবোলার মতো মাটির কাছাকাছি নেমে গেছে। পরঞ্জয় এই বয়সেও দারুণ চটপটে। ডাল বেয়ে সাতকড়ির বাগানে নামতে তাঁর তিন মিনিটও লাগল না। পবন আর মহেন্দ্রর সময় একটু বেশি লাগল।

অন্ধকার বাগানে নেমে তিনজন একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চারদিক নিস্তব্ধ। শুধু ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। কাছেপিঠেই কোথাও একঝাঁক শেয়াল ডাকল।

মহেন্দ্র বললেন, এবার?

পরঞ্জয় চাপা গলায় বললেন, চারদিকে মেলা গাছপালা রয়েছে। কিছু দেখার উপায় নেই। চলো, বাড়িটার দিকে এগোই।

পবন বললেন, কুকুর নেই তো !

থাকতে পারে। তবে কুকুর যদি তাড়া করে তবে ওদেরই আগে করবে। এসো।

চারদিকে দুর্ভেদ্য গাছপালা। বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভাল। পরঞ্জয় অভিজ্ঞ মানুষ। জঙ্গল ভেদ করে তিনিই আগে চললেন। পেছনে পবন আর মহেন্দ্র । খানিক দূর গিয়ে একটা পুকুরধারে পৌঁছালেন তারা। পুকুরের ওপাশে দুর্গের মতো বাড়ি।

পবন বললেন, ও বাবা, এ তো বিশাল বাড়ি। সাতকড়ি কোন ঘরে থাকে তা বুঝব কী করে?

পরঞ্জয় বললেন, আগে থেকে অত ফ্যাঁকড়া তুলে লাভ কী? চলো দেখাই যাক।

পুকুরধার ধরে এগিয়ে গিয়ে তাঁরা বাড়ির পেছন দিকটায় পৌঁছলেন। গোটা বাড়িটাই অন্ধকার । কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। দরজা জানালা সবই আঁট করে বন্ধ।

পবন বললেন, পরঞ্জয়বাবু, সুজন আর নিতাইকে তো দেখা যাচ্ছে না।

না, ওরাও এন্ট্রান্স খুঁজছে নিশ্চয়ই। এসো, আমরাও চারদিকটা ঘুরে দেখি।

ঘুরে দেখাও সোজা ব্যাপার নয়। বাড়ির চারদিকে মেলা ঝোপজঙ্গল এবং বড় বড় গাছ।

পরঞ্জয় টর্চ আর জ্বালছিলেন না। অন্ধকারেই ঠাহর করে করে এগোতে এগোতে হঠাৎ থেমে হাত তুললেন।

কেউ কোনও কথা বলল না। সামনেই একটা নিমগাছ। গাছটা দোতলা ছাড়িয়ে ছাদে গিয়ে পৌঁছেছে।

পরঞ্জয় একটু ইশারা করে গাছটা বেয়ে উঠতে লাগলেন।

কোথায় উঠছেন? পবন চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করে।

ছাদে।

এখানে হেলানো ডাল নেই। খাড়া গাছে ওঠাও শক্ত। তাছাড়া মহেন্দ্র কাঠের বাক্সটা নিয়ে উঠতেও পারবেন না।

পরঞ্জয় উঠতে উঠতেই বললেন, তোমরা দাঁড়াও, আমি দেখে আসছি। মনে হয় এটা দিয়েই ওরা ছাদে উঠেছে। ছাদ দিয়ে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করবে।

অগত্যা দুজনে নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। হনুমানকেও লজ্জা দেওয়ার মতো দক্ষতায় টারজানকেও হারিয়ে দেওয়ার মতো দ্রুতবেগে পরঞ্জয় দোতলা ছাড়িয়ে ছাদের কাছে উঠে গেলেন। তারপর আর তাঁকে দেখা গেল না।

মহেন্দ্র বললেন, “আশ্চর্য লোক বটে!”

২৫তম পরিচ্ছেদ

প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই ঘটল না। চারদিক নিশ্চুপ, শুধু ঝিঁঝি ডাকার শব্দ। মহেন্দ্র উৎকর্ণ হয়ে ছিলেন, চাপা গলায় বললেন, ভেতরে কী হচ্ছে কে জানে। আমাদেরও কি ভেতরে যাওয়া উচিত?

পবন বললেন, ক্ষেপেছো? ওই খাড়া নিমগাছ বেয়ে ওঠা আমার কর্ম্ম নয়। আমি বাঘ ভালুককেও ডরাই না, কিন্তু খাড়া জায়গায় উঠতে আমার ভারি ভয়।

কিন্তু তা বলে তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। পরঞ্জয়বাবুকে তো দেখলে, এই বয়সেও কেমন তরতর করে উঠে গেলেন।

আরে ওঁর কথা বাদ দাও। জঙ্গলে থেকে থেকে ওঁর একটা জংলি ভাব এসে গেছে। হয়তো হনুমান আর বাঁদরদের কাছে ট্রেনিং নেন। উনি পারলে কি আমাদেরও পারতে হবে?

একটু চেষ্টা করলে হত। আমার বেশ উদ্বেগ হচ্ছে।

আচমকা পবন হাত বাড়িয়ে মহেন্দ্রর মুখে চাপা দিয়ে বলল, চুপ! কে যেন আসছে। এসো, ওই ঝোপটার আড়ালে দাঁড়াই।

অন্ধকার তাঁদের চোখে সয়ে গেছে। তাই দেখতে তেমন অসুবিধে হচ্ছিল না। পুকুরের ধার ধরে একজন নয়, পরপর তিনটে ভূতুড়ে মূর্তিকে সন্তপর্ণে আসতে দেখা গেল। হাবভাব মোটেই ভাল নয়।

খুব চাপা গলায় পবন বললেন, অন্ধকারে ঠাহর করা মুশকিল। তবে মনে হচ্ছে এরা সেই তিন চোর।

কাদের কথা বলছো?

একজন হল জগা, অন্যজন পাগলু, তিন নম্বরটা ওদের এক স্যাঙাৎ। নাম জানি না।

মহেন্দ্র বললেন, হুঁ, জগা আর পাগলুকে চিনি। এরা চায় কী?

গুপ্তধন ছাড়া আর কী চাইবে বলো! কয়েক ঘণ্টা আগেই এদেরই তো অজ্ঞান করে ফেলে রেখে এসেছিলেন আমাদের সুজনবাবু ওষুধটা হয়তো তেমন জোরালো ছিল না, তাই চটকা ভাঙতেই তিনজন হাজির হয়েছে এসে। ভালই হয়েছে। এদের কাজে লাগানো যেতে পারে।

তার মানে?

শোনো, মানে না জেনে কি আর কথাটা তুলেছি? ভেতরে কী ঘটছে না ঘটছে আমরা জানি না, এদের তিনজনকে যদি ভেতরে পাঠানো যায় তাহলে পরঞ্জয়বাবুর একটু জোর হয়। এদের কাছে গাছ বেয়ে ছাদ ডিঙানো কোনও সমস্যা নয় । লোকবলও তো দরকার।

কিন্তু এরা যদি খুনোখুনি করে?

সে এলেম এদের নেই। ছাপোষা ছিচকে চোর সব। তুমি বাক্সটা নিয়ে আড়ালে থাকো, আমি গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা কই।

দেখো, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন না নষ্ট হয়।

হবে না। কোনও ভয় নেই, তাছাড়া সুজনের ওপর এদের রাগও আছে সেই রাগটাও আমাদের কাজে লাগবে।

পাগলু, জগা আর রামু ইতিউতি চাইতে চাইতে নিমগাছটার তলাতেই এসে দাঁড়াল। তাদের চোরের চোখ, বাড়ির ভেতরে ঢোকার এইটাই যে সোজা পথ তা লহমায় বুঝতে পেরেছে।

জগা বলল, পাগলুদাদা, এবার কী করা?

জয় মা বলে ঢুকে পড়তে হবে। সুজনবাবু এতক্ষণে কাজ সেরে ফেলেছে কি না কে জানে।

রামু বলল, আরে নেহি ভাই, কাম সারতে সোময় লাগবে। লেকিন হামলোক ঘুসে করব কী?

কেন, আর কিছু না হোক সাতকড়ির বাড়িতে দামি জিনিসের অভাব কী? সুজনবাবু ভাগ না দিলে অন্যভাবে পুষিয়ে নিতে পারবে।

জগা আর পাগলু একইসঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ, সেটা ঠিক কথা। তাছাড়া সুজনবাবুও পিস্তল হাতে সাতকড়ির বাড়িতে ঢুকেছে, তাকেও পেয়ে যাবে। মোকাবিলাটাও করে নিতে পারবে।

জগা আর পাগলু সোৎসাহে বলে উঠল, তা তো বটেই। হঠাৎ রামু বলে উঠল, আরে ভাই, ই তো তাজ্জব কি বাত, হামলোগ তো তিন আদমি থা, লেকিন এই চৌঠা আদমি কোন আছে?

জগা বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, এ পাগলুদাদা, আমরা তো তিনজন ছিলাম, তাই না?

তাই তো মনে হচ্ছে। দাঁড়াও তো গুনে দেখি, এক...দুই...তিন...চার...নাঃ, এ তো চারজনই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখছি, তবে কি চারজনই ছিলাম?

পাগলু একটু মাথা চুলকে বলল, মাথাটা ভাল কাজ করছে না। সুজনবাবু যে কী ওষুধটা খাওয়ালেন, মাথাটা একেবারে গুবলেট হয়ে গেছে। তিনজন না চারজন থাকার কথা সেটা পর্যন্ত ভুল হয়ে যাচ্ছে।

এ বার চতুর্থজন মোলায়েম গলায় বলল, দুশ্চিন্তা কোরো না হে, আমি তোমাদের দলের লোক নই। আমার নাম পবনকুমার সামন্ত ।

পাগলু সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করে বলল, উরেববাস, পবনবাবু! প্রাতঃপেন্নাম হই, প্রাতঃপেন্নাম হই, তা আপনি এখানে?

কাজেই এসে পড়েছি। ভিনগাঁয়ে অচেনা জায়গায় তোমাদের দেখে ভারি ভালও লাগছে। তোমরা কেন এসেছে তাও জানি। আর দেরি না করে এই গাছ বেয়ে ছাদে উঠে যাও। ভেতরে ঢোকার পথ পাবে, সুজনবাবু আর নিতাই পালও ঢুকেছে। আর শোনো, পরঞ্জয়বাবুকে চেনো?

আজ্ঞে, খুব চিনি ।

উনিও আছেন, তবে উনি আমাদের লোক। যাও ঢুকে পড়ে গিয়ে।

যে আজ্ঞে।

বলে তিনজন আর দ্বিরুক্তি না করে গাছ বেয়ে উঠে পড়তে লাগল, তাদের কাছে কাজটা জলবত্তরলং। ছাদে উঠে তিনজন দেখল সিঁড়িঘরের দরজা হাট করে খোলা।

পাগলু বলল, চল চল, দেরি হয়ে না যায়। তিনজনেই অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নেমে এল। রামু চাপা গলায় বলল, ভাই, হামার হিস্যা উস্যা লাগবে না। হামি এখুন যা পারি মাল নিয়ে চলিয়ে যাবো, তুমলোগ হিস্যা উস্যা বুঝে লিও।

জগা বলল, আরে মাল তো আমরাও সরাব, এখন আলাদা হলে কিন্তু ভাল হবে না রামুদাদা।

আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। বাড়িটা বিশাল, অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে তারা দিশাহারা হয়ে যেতে লাগল। ঘরের পর ঘর, তার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র অলিগলি, রাজ্যের জিনিসপত্র চারদিকে । কিন্তু লোকজন কোথাও আছে বলে মনে হল না।

পাগলু বলল, হ্যাঁ রে, সাতকড়ি কি এত বড় বাড়িতে একা থাকে?

তা কে জানে ?

লোকজন নেই কেন? থাকার তো কথা। দিনুগুণ্ডা বলেছিল, সাতকড়ির চারদিকে নাকি শক্ত পাহারা।

দূর! কোথায় কী?

সুজনবাবুদেরও তো চিহ্ন দেখছি না। শোনো পাগলুদাদা, আমার মনে হয়, নিচের তলাতেই আসল গাড্ডা, চলো নিচে নামি।

তারা ধীরে ধীরে একতলায় নেমে এল । সিঁড়ির গোড়াতেই মস্ত মোটা শক্ত গরাদ দিয়ে পথ আটকানো।

ও বাবা ! এ যে দেখছি জেলখানার ফটক!

পাগলু বলল, ওরে ভাল করে দেখ, ওরা যখন ভেতরে ঢুকেছে তখন গরাদেও ফাঁক আছে।

বাস্তবিকই তাই, দেখা গেল, গরাদের গায়ে তালাটা ঝুলছে বটে, কিন্তু সেটা খোলা, সপ্তপর্ণে তালা সরিয়ে তারা ফটক খুলে ঢুকল।

একতলাতেও আর এক ভুলভুলাইয়া। চারদিকে অজস্র গলিখুঁজি, অজস্র ঘর, অজস্র বন্ধ দরজা।

জগা বলল, এ তো গোলকধাঁধাঁ দেখছি। রামু জিনিসপত্র খুঁজতে খুঁজতে বলল, হাঁ হাঁ উ বাত তো ঠিক আছে। কিন্তু চুরানেকে লিয়ে কোই চিজ তো মিলছে না রে জগুয়া।

মিলবে মিলবে। সবুরে মেওয়া ফলে। তিনজনে মিলে গুটিগুটি এগোতে এগোতে আচমকাই একটা পিস্তলের শব্দ পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। দুম দুম করে দুটো ফায়ার হল। কে যেন আঃ বলে একটা আর্তনাদ করে উঠল।

ই কী পাগলুদা?

ওরে, খেল শুরু হয়ে গেছে, চল চল। শব্দটা সামনে থেকেই এসেছিল। তিনজনে একটু দ্রুত পায়ে এগোতে লাগল।

বেশিদূর এগোতে হল না। সামনে একটা লম্বা প্যাসেজের শেষ প্রান্তে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। বেশ লম্বাচওড়া লোক।

তিনজনেই হাঁটু গেড়ে বসে লোকটাকে ঠাহর করল, পাগলু বলল, এই তো পরঞ্জয়বাবু!

২৬তম পরিচ্ছেদ

পরঞ্জয়বাবুর বা কাঁধে গুলি লেগেছে। রক্তে ভাসাভাসি কাণ্ড। তবে শক্ত ধাতের লোক বলে জ্ঞান আছে। একটু আঃ উঃ করে উপুড় থেকে পাশ ফিরে কাত হয়ে তাদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা কারা?

পাগলু বলল, আমি পাগলু, এ জগা আর ও রামুয়া। আপনাকে কারা মারল?

বোধহয় সুজনবাবু। অন্ধকারে কি আর ভাল করে দেখেছি? তবে চিন্তার কিছু নেই। চোট লেগে কাহিল হয়ে পড়লেও মরছি না। তোমাদের আমি চিনি। হরিপুরের লোক তোমরা, চুরিটুরি করো, তাই না?

যে আজ্ঞে। শোনো বাপু, সুজনবাবুর সঙ্গে নিতাই পাল আর শূলপাণিও আছে। তবে শূলপাণিকে ওরা ধরে এনেছে, তার দুটো হাত বাঁধা বলেই মনে হল। তোমরা একটু এগোলে বাঁয়ে পথ পাবে। ওরা আমাকে গুলি করেই ওদিকে গেছে। সাবধান।

যে আজ্ঞে। কিন্তু ওনাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে কি? দেখি চেষ্টা করে। পরঞ্জয়বাবু উঠে বসলেন, বললেন, হেঁটে যেও না, হামাগুড়ি দিয়ে যাও, পিস্তল

তুললে মেঝেতে শুয়ে পড়লেই হবে। যাও।

তিনজনে এগোতে লাগল, বাঁয়ে একটা গলি পেয়ে একটু ঢুকতেই সামনে একটা ঝনাৎ করে শব্দ হল, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলা আওয়াজ কৌন হ্যায় রে?

ফের একটা গুলির শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ।

জগা বলল, বাপ রে! এতো খুন-খারাপির কারবার!

পাগলু বলল, তাই দেখছি। তবু চল এগোই।

গলিটা ডানধারে বেঁকেছে এবং সেখানে একটা লোহার দরজা। এখানেও একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার হাতে একটা খোলা ভোজালি। অন্য হাতে টর্চ, টর্চ জেলে দেখা গেল, এ লোকটার পেটে গুলি লেগেছে। জ্ঞান নেই, তারা আর সময় নষ্ট না করে দরজাটা ঠেলল, সেটা খুলেও গেল। পাগলু বলল, সুজনবাবু যে আমাদের চেয়েও অনেক পাকা লোক দেখছি !

রামু বলল, হাঁ হাঁ, উস্তাদ লোক আছে, ইনকে পাস শিখনেসে আচ্ছা হোগা।

একটু সামনে সুজনবাবুরা একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

সুজনবাবু বললেন, নিতাই, এটাই সাতকড়ির ঘর মনে হচ্ছে। দরজাটা কাঠের হলেও বেশ ভারী আর কারুকাজ করা।

তাই তো মনে হচ্ছে। সুজনবাবু শূলপাণির দিকে চেয়ে বললেন, এবার বলো শূলপাণি, সাতকড়িকে কী বলতে হবে।

আমি জানি না। তুমি সব জানো। সাতকড়ির সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ছিল, তুমি প্রায়ই এখানে আসতে সেটা তো নিজের মুখেই কবুল করেছো।

তা আসতাম। তবে সংকেত-টংকেত কিছু জানি না।

সে কথা বললে হবে কেন? সাতকড়িকে খোলানোর কৌশল তোমার ভালই জানা আছে।

আমাকে ছেড়ে দিন, আমি কিছু জানি না।

দেখ বাপু, তীরে এসে তরী ডুবলে তো আমার চলবে না। হাতে বেশি সময়ও নেই। টালবাহানা করলে আমাকে অন্য পন্থা নিতে হবে।

এই বলে সুজনবাবু পিস্তলটা একটু নাচালেন।

ভয় খেয়ে শূলপাণি বলল, আজ্ঞে বেবাক ভুলে গেছি।

কিছুই ভোলোনি বাপু ভুলবার পাত্র তুমি নও। পাগল সেজে অনেকের চোখকে ফাঁকি দিয়েছে বটে, কিন্তু আমাকে পারোনি। হরিদাসপুরের আমার লুটের ফেরারী আসামী তুমি। হরিপুরে ঘাপটি মেরে পাগল সেজে চোরাই অস্ত্রের

চালানদার ছিলে। তোমার নামে হুলিয়া বেরিয়েছিল। যদি ভাল চাও তো যা বলছি করো। নইলে বিপদ আছে।

শূলপাণি মাথাটা ঝুঁকিয়ে একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি যা শুনেছেন তার সব সত্যি নয়। আর্মারি লুটের দলে আমি ছিলাম বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছেয় নয়। না থাকলে আমাকে খুন করা হত। আর অস্ত্র চালানের ব্যাপারেই আমার কী করার ছিল বলুন। আপনার স্যাঙাৎ নিতাই পালই তো ছিল নাটের গুরু। যাকগে এসব কথা, আমার জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে। নইলে সাতকড়িবাবুর কাছ থেকে ভাল রকম দাঁও মেরে কবেই বড়লোক হতে পারতুম। কিন্তু আমার জানা ছিল ও সম্পত্তির অন্য মালিক আছে। আমি লোক তত খারাপ নই সুজনবাবু।

না, তুমি গঙ্গাজলে ধোয় তুলসীপাতা। বেশি সাধুসেজো না, তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিলে বোধহয় পাঁচ-দশ হাজার টাকা পুরস্কারও পাওয়া যাবে। যা বলছি যদি ঠিকঠাক করো তাহলে ছেড়ে তো দেবই, চাও তো বখরাও দিতে পারি।

আগে বলুন, সাতকড়িবাবুকে খুনটুন করবেন না।

আরে না হে, না। খুন করব কেন? খুনের অনেক ফ্যাঁকড়া। কাজটা গুছিয়ে নিতে পারলে ওসব করতে যায় কোন বোকারাম?

তাহলে পিস্তলটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিন।

একটু দোনোমোনো করে সুজনবাবু তাই করলেন। শূলপাণির দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা, সুতরাং সে পিস্তল দিয়ে কিছু করতে পারবে না।

শূলপাণি গলাখাকারি দিয়ে চোখ বন্ধ করল। তারপর বেশ সুরেলা গলায় গীতার একটি শ্লোক আবৃত্তি করতে লাগল, ন চ তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে, যোগীনাং হৃদয়ে ন চ, মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ... ইত্যাদি। শ্লোক আবৃত্তি শেষ হলে শূলপাণি ডাকল, সাতকড়িবাবু, আমি শূলপাণি, দরজা খুলুন।

ঠিক তিনবার কথাটা বলে সে চুপ করল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর দরজার খিলটিল খোলার আওয়াজ হতে লাগল। একটু পরেই একটা দরজা ফাঁক হয়ে একজন বুড়ো মানুষ দেখা দিলেন। হাতে লণ্ঠন। এত লোক দেখে একটু তটস্থ হয়ে বললেন, এসব কী শূলপাণি? এরা কারা?

জবাবটা দিলেন সুজনবাবু, আমরা আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই, সময় বেশি নেই।

বুড়ো মানুষটি খুবই অবাক হয়ে বললেন, এই মাঝরাতে এমন কী কথা!

মাঝরাতে ছাড়া সুবিধে হচ্ছিল না মশাই, চলুন, ভেতরে চলুন।

সাতকড়িবাবুকে একরকম ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে সুজনবাবু ঢুকলেন, বিনা ভূমিকায় বললেন, সাতটা কড়ি আর সাতটা পয়সার রহস্যটা কী তা আমি জানি

না। কিন্তু আমিই সেই পয়সা আর কড়ির মালিক। এবার আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দিন।

আপনি মালিক? কিসের মালিক! পয়সা বা কড়িই বা কিসের? আমি ওসব কিছু জানি না। আপনি কি ডাকাতি করতে ঢুকেছেন?

তাও বলতে পারেন। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আমি আঙুল বাঁকাতেও জানি।

হঠাৎ সাতকড়ির সাতানব্বই বছরের জীর্ণ শরীরটা টানটান হয়ে দাঁড়াল। গলার জোরও বাড়ল। সাতকড়িবাবু বললেন, বাপু হে, আমার বয়স সাতানব্বই হয়েছে, আমাকে ভয় দেখিও না। প্রাণের ভয় আমার নেই। অন্যায্য কিছু আমার কাছে আদায় করতে পারবে না। তবে জোর খাটালে খাটাতে পারো।

সুজনবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে শূলপাণির পকেট থেকে পিস্তলট টেনে বের করে বললেন, তবে তাই হোক। আমাদের আর তর্ক করার সময় নেই। কাজ হাসিল করে কেটে পড়তে হবে।

সুজনের বোধহয় ইচ্ছে ছিল সাতকড়িবাবুকে ঘায়েল করে চাবির গোছাটা হাতিয়ে নিয়ে ঘরে রাখা সিন্দুক আর বাক্সগুলো খুলে যা পারেন হাতিয়ে নেবেন। কিন্তু পিস্তলটা তুলতে যেতেই হঠাৎ শূলপাণি তাঁর হাতে একখানা পেল্লায় লাথি কষিয়ে নিজেও পড়ে গেল। সুজনবাবুর হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে গিয়ে দেয়ালে লেগে মেঝেয় পড়ল ।

সুজনবাবু হিংস্র গলায় বললেন, বীরত্ব দেখাচ্ছো ! বীরত্ব ! দাঁড়াও বীরত্ব বের করছি।

সুজনবাবু পিস্তলটা গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে দাঁড়াতেই তিনটে আবছা মূর্তি হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। সুজনবাবু পিস্তলটা তুলবার সময় পেলেন না। তার আগেই তাঁকে কোমর ধরে পেড়ে ফেলল জগা। নিতাই পালকে পাকড়াল রামু আর পাগলু।

আধঘণ্টা বাদে ঘরের মধ্যে জড়ো হলেন পরঞ্জয়, পবন এবং মহেন্দ্র। শূলপাণির বাঁধন খুলে সুজন আর নিতাইকে বাঁধা হয়েছে।

সাতকড়ি একখানা আসত কাচ দিয়ে মহেন্দ্রর পয়সা আর কড়িগুলো দেখছিলেন। তারপর বললেন, সব ঠিকই আছে বাবা, তোমার প্রপিতামহ দীর্ঘজীবী ছিলেন, রসিকও ছিলেন। আমাকে বেশ কিছু টাকা দিয়ে বলেছিলেন, ব্যবসায় খাটাতে। আর বলেছিলেন যদি তাঁর নাতি বা তস্যপুত্র কেউ সংকেত ভেদ করে দাবি করে তাহলেই এই টাকা শোধ দিতে হবে। নইলে নয়। তা আমার বাপু টাকা-পয়সার তেমন দরকার নেই। ভোগই বা করবে কে বলো! যক্ষের মতো লাখো লাখো টাকা আগলে আছি বলেই বোধহয় প্রাণটাও বেরোচ্ছে না। তুমি আমাকে এবার ভারমুক্ত করো।

তা সুদে আসলে বড় কমও হয়নি। ধরো প্রায় সাত লক্ষ টাকা।

সুজন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভোর হচ্ছিল,জানালা দিয়ে একটুকরো তেরছা লাল রোদ এসে দেয়ালে পড়ল।

****সমাপ্ত****